POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023--2025

আল্লাহ্‌র বাণী

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ

তোমাদের মধ্য হইতে যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ্ তাহাদের সঙ্গে ওয়াদা করিয়াছেন যে, তিনি অবশ্যই তাহাদিগকে পৃথিবীতে খলীফা নিযুক্ত করিবেন যেভাবে তিনি তাহাদের পূর্ববর্তীগণকে খলীফা নিযুক্ত করিয়াছিলেন

(সূরা নূর, আয়াত: ৫৬)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 8

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

www.akhbarbadarqadian.in

সংখ্যা 20-21

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

বৃহস্পতিবার 18-25 মে, 2023 27 শওয়াল-4 যুল কাদা 1444 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

খিলাফত সংখ্যা

তোমাদের জন্য দ্বিতীয় কুদরত দেখাও প্রয়োজন এবং এর আগমন তোমাদের জন্য শ্রেয়। কেননা, এটা স্থায়ী, এর ধারাবাহিকতা কিয়ামত পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হবে না। আমি খোদার মূর্তিমান কুদরত। আমার পরে আরো কয়েকজন ব্যক্তি যাঁরা দ্বিতীয় বিকাশ হবেন।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর বাণী

" হে বন্ধুগণ! যেহেতু আদিকাল থেকে আল্লাহতা'লার বিধান হচ্ছে, তিনি দু'টি শক্তি প্রদর্শন করেন যেন বিরুদ্ধবাদীদের দু'টি মিথ্যা উল্লাসকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করে দেখান; সুতরাং খোদাতা'লা তাঁর চিরন্তন নিয়ম পরিহার করবেন এখন এটা সম্ভবপর নয়। এজন্য আমি তোমাদেরকে যে কথা বলেছি তাতে তোমরা দুঃখিত ও চিন্তিত হয়ো না। তোমাদের চিত্ত যেন উৎকণ্ঠিত না হয়। কারণ তোমাদের জন্য দ্বিতীয় কুদরত দেখাও প্রয়োজন এবং এর আগমন তোমাদের জন্য শ্রেয়। কেননা, এটা স্থায়ী, এর ধারাবাহিকতা কিয়ামত পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হবে না। সেই দ্বিতীয় কুদরত আমি না যাওয়া পর্যন্ত আসতে পারে না কিন্তু যখন আমি চলে যাবো, খোদা তখন তোমাদের জন্য সেই দ্বিতীয় কুদরত প্রেরণ করবেন যা চিরকাল তোমাদের সাথে থাকবে। যেহেতু 'বারাহীনে আহমদীয়া' গ্রন্থে খোদার প্রতিশ্রুতি রয়েছে এবং সেই প্রতিশ্রুতি আমার নিজের সম্বন্ধে নয় বরং তা তোমাদের সম্বন্ধে। যেমন খোদাতা'লা বলেছেন :-অর্থাৎ- 'আমি তোমার অনুবর্তী এ জামা'তকে কিয়ামত পর্যন্ত অন্যের উপর প্রাধান্য দেবো' (অনুবাদক)। সুতরাং তোমাদের জন্য আমার বিচ্ছেদ দিবস উপস্থিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী, যেন এরপর সেই চিরস্থায়ী প্রতিশ্রুত দিবস এসে যায়। আমাদের খোদা প্রতিশ্রুতি পালনকারী, বিশ্বস্ত এবং সত্যবাদী খোদা। তিনি তাঁর অঙ্গীকারকৃত সব কিছুই তোমাদেরকে দেখাবেন। যদিও বর্তমান যুগ পৃথিবীর শেষ যুগ এবং বহু বিপদাপদ রয়েছে যা এখন অবতীর্ণ হবার সময় , তবুও সেই সব বিষয় পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত এ দুনিয়া অবশ্যই কায়েম থাকবে, যার সম্বন্ধে খোদা সংবাদ দিয়েছেন। আমি খোদার পক্ষ থেকে এক প্রকার কুদরত হিসেবে আবির্ভূত হয়েছি। আমি খোদার মূর্তিমান কুদরত। আমার পরে আরো কয়েকজন ব্যক্তি যাঁরা দ্বিতীয় বিকাশ হবেন। অতএব, তোমরা খোদার কুদরতে সানীয়ার (দ্বিতীয় কুদরত) অপেক্ষায় সমবেতভাবে দোয়া করতে থাকো। প্রত্যেক দেশে নিষ্ঠাবানদের জামা'তের সমবেতভাবে দোয়ায় নিয়োজিত থাকা বাঞ্ছনীয় যেন দ্বিতীয় কুদরত আসমান থেকে অবতীর্ণ হয় এবং তোমাদের খোদা কত মহাপরাক্রমশালী তাও তোমাদেরকে দেখানো হয়। নিজ মৃত্যুকে জামা'তের পবিত্রচেতা বুযূর্গগণ আমার পর আমার নামে লোকদের বয়আত (দীক্ষা) নিবেন।

* খোদাতা'লা চাচ্ছেন, পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত সব সাধু প্রকৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরকে, তৌহীদের প্রতি আকৃষ্ট করেন এবং তার ভক্ত দাসদেরকে এক ধর্মে একত্রিত করেন তারা ইউরোপেই বাস করুক বা এশিয়াতেই বাস করুক। এটাই খোদাতা'আলার অভিপ্রায় আর এজন্যেই আমি পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছি। সুতরাং তোমরা এই উদ্দেশ্যের অনুসরণ কর; কিন্তু বিনম্র ব্যবহার, নৈতিক উৎকর্ষ ও দোয়ার প্রতি গুরুত্ব আরোপ সহকারে। যে পর্যন্ত কেউ রূহুল কুদু স বা পবিত্রাত্মা প্রাপ্ত হয়ে দন্ডায়মান না হয় (সে পর্যন্ত) সবাই আমার পরে সম্মিলিত ভাবে কাজ করতে থাক। "

(আল ওসীয়ত)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

"مَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ قَيْدَ شِبْرٍ
فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهٖ" (حدیث)

যে ব্যক্তি জামাত থেকে বিন্দু মাত্র পৃথক হয়েছে, পক্ষান্তরে সে ইসলামের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে গেছে।

প্রিয় নবী হযরত মহম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যে, উম্মতে মুহাম্মাদীয়ায় শেষ যুগে ইমাম মাহদী তথা প্রতিশ্রুত মসীহ্‌র আবির্ভাব হবে। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) দাবি করেন, আঁ হযরত (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে তিনিই এই যুগের মুজাদ্দিদ বা সংস্কাক, মসীহ ও মাহদী। তিনি মহম্মদ (সা.)-এর উম্মতী নবী হওয়ার দাবি করেন। তিনি বলেন, আমার নিজস্ব বলতে কিছুই নেই। যা কিছু আমার রয়েছে তা মহম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর। আর উম্মতী নবী হওয়ার অর্থই হল তার নিজস্ব কিছু থাকবে না, সমস্ত কিছু অনুসৃত নবীর প্রতি আরোপিত হবে। আমাদের অ-আহমদী মুসলমান ভাইয়েরাও স্বীকার করে যে, হযরত ঈসা (আ.) যখন আকাশ থেকে অবতরণ করবেন, তখন তিনি একজন উম্মতী নবী হবেন। অর্থাৎ তারাও একজন উম্মতী নবীর আগমণে বিশ্বাসী। কিন্তু সমস্যা হল, কুরআন মজীদে বিভিন্ন স্থানে তাঁর মৃত্যুর ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। সুতরাং যে ঈসার আগমণের সংবাদ দেওয়া হয়েছিল, বস্তুতপক্ষে এই উম্মত থেকেই তাঁর আগমণের কথা ছিল। কিন্তু তিনি যেহেতু মসীহ নাসেরীর গুণে গুণান্বিত হয়ে আসার কথা ছিল তাই তাঁর নাম মসীহ রাখা হয়েছে। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী মসীহ মওউদ (আ.) ও মাহদী (আ.) এর মৃত্যুর পর ১৯০৮ সাল থেকে জামাত আহমদীয়ার মাঝে খিলাফত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত আছে। এই খিলাফতের সংবাদ আঁ হযরত (সা.)-এর স্বয়ং দিয়ে রেখেছিলেন। এক দীর্ঘ হাদীসে আঁ হযরত (সা.) ইসলামের বিভিন্ন যুগের কথা উল্লেখ করার পর বলেন- ثُمَّ تَكُوْنُ خِلَافَةٌ عَلٰى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ অর্থাৎ অতঃপর নবুয়্যতের পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। অতঃপর তিনি নীরব হয়ে যান, অন্য কোনও যুগের কথা তিনি আর বলেন নি। যা থেকে প্রমাণিত হয় যে, এই 'খিলাফত আলা মিনহাজিন নবুয়্যত' কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। জামাত আহমদীয়ায় ১১৫ বছর থেকে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত আছে। এই খিলাফতের সত্যতার এই একটিই প্রমাণ যথেষ্ট যে, খিলাফতে রাশেদার পর মুসলমানদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য সমস্ত খিলাফত ধরাশায়ী হয়েছে। খলীফাতুল মুসলেমীন হওয়ার বাসনা পোষণকারীরা ধ্বংস হয়ে গেছে। কিন্তু যেটা প্রকৃত খিলাফত তা ১১৫ বছর থেকে নির্বিবাদ ও নির্বিঘ্নভাবে প্রতিষ্ঠিত আছে। এই খিলাফতের বৈভব ও মর্যাদা প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই খিলাফতের ক্ষতিসাধনের বাসনাকারীরা ধ্বংস হয়ে গেছে, কিন্তু খিলাফত ধ্বংস হয় নি, আর ভবিষ্যতেও ধ্বংস হবে।

আল্লাহ্ তা'লা সূরা নূরের মধ্যে উম্মতে মুহাম্মাদীয়ায় খিলাফত প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেন-

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۪ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا ؕ يَعْبُدُوْنَنِيْ لَا يُشْرِكُوْنَ بِيْ شَيْـًٔا ؕ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۝

অনুবাদ: তোমাদের মধ্য হইতে যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ্ তাহাদের সঙ্গে ওয়াদা করিয়াছেন যে, তিনি অবশ্যই তাহাদিগকে পৃথিবীতে খলীফা নিযুক্ত করিবেন যেভাবে তিনি তাহাদের পূর্ববর্তীগণকে খলীফা নিযুক্ত করিয়াছিলেন; এবং অবশ্যই তিনি তাহাদের জন্য তাহাদের দীনকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিবেন যাহাকে তিনি তাহাদের জন্য মনোনীত করিয়াছেন, এবং তাহাদের ভয়-ভীতির অবস্থার পর উহাকে তিনি তাহাদের জন্য নিরাপত্তায় পরিবর্তন করিয়া দিবেন; তাহারা আমার ইবাদত করিবে, আমার সঙ্গে কোন কিছুকেই শরীক করিবে না। এবং ইহার পর যাহারা অস্বীকার করিবে, তাহারাই হইবে দুষ্কৃতকারী। (সূরা নূর, আয়াত: ৫৬)

কারো মনে যেন এই ধারণা না জাগে যে, 'মিনকুম' বলতে সাহাবাদেরকে বোঝানো হয়েছে এবং প্রতিশ্রুতি অনুসারে তাদের মধ্যে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বস্তুতপক্ষে, সাহাবাদের মাধ্যমে সমগ্র উম্মতে মুহাম্মাদীয়াকে সম্বোধন করা হয়েছে। আর উম্মতে মুহাম্মাদীয়ার মধ্যে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে চিরস্থায়ী খিলাফতের প্রতিশ্রুতি রয়েছে। আর আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুসারে উম্মতে মুহাম্মাদীয়ায় চিরস্থায়ী খিলাফত প্রতিষ্ঠিত করেছেন। যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আলহামদো লিল্লাহি আলা যালিক। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন-

'যেহেতু 'মিনকুম' শব্দ দ্বারা সাহাবাদের সম্বোধন করা হয়েছে, তাই এই খিলাফত সাহাবাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে- এমনটা প্রমাণ করার অযৌক্তিক। যদি এভাবেই কুরআন করীমের তফসীর হয়,তবে এক্ষেত্রে ইহুদীদের থেকেও বেশি অনাচার হবে। এখন স্পষ্ট থাকে যে, 'মিনকুম' শব্দ কুরআন করীমে প্রায় বিরাশিটি স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে। আর দুই

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	২
খুতবা জুমআ হুযুর আনোয়ার (আই.)	৩
হযরত খলীফাতুল মসীহর দোয়া গৃহিত হওয়ার ঘটনাবলী	৯
প্রসঙ্গ সন্তান প্রতিপালন ও আহমদী মায়েদের দায়িত্বাবলী	১২
খিলাফত-নিরাপত্তার দুর্গ	১৫
খিলাফত, শান্তি ও নিরাপত্তা	১৭
খিলাফতের আনুগত্য- সফলতার চাবিকাঠি	২১

বা তিনটি স্থান ছাড়া, যেখানে বিশেষ উপমার ব্যবহার হয়েছে, সমস্ত ক্ষেত্রেই 'মিনকুম' বলতে সেই সকল মুসলমান জাতিকে বোঝানো হয়েছে যারা কিয়ামত পর্যন্ত জন্ম নিতে থাকবে।"

(শাহাদাতুল কুরআন, রূহানী খাযায়েন, ৬ষ্ঠ খণ্ড,পৃ: ৩৩১)

উম্মতে মুহাম্মাদীয়ায় চিরস্থায়ী খিলাফতের সুসংবাদ দান করতে গিয়ে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন- " কোন মানুষ এ জগতে চিরস্থায়ী নয়। তাই খোদা তা'লা ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, রসূলদের সত্তা যা পৃথিবীর সকল সত্তার চেয়ে অধিক সম্মানিত ও পবিত্র, তা যেন প্রতিচ্ছায়ারূপে কিয়ামত পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত থাকে। সুতরাং, খোদা তা'লা এই উদ্দেশ্যেই খিলাফত ব্যবস্থার সূচনা করেছেন যাতে পৃথিবী কোনও যুগেই রিসালতের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত না থাকে। তাই যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে, খিলাফত কেবল ত্রিশ বছর কালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, সে নিজের অজ্ঞতার কারণে খিলাফতের উদ্দেশ্যকে উপেক্ষা করে। সে জানেনা যে, রসুল করীম (সা.)-এর মৃত্যুর পর তাঁর রিসালতকে কেবল ত্রিশ বছরের জন্যই খলীফাদের পোশাকে জিইয়ে রাখা জরুরী, এর পর যা খুশি হোক- এমনটি মোটেই আল্লাহ্ তা'লার উদ্দেশ্য ছিল না।

(শাহাদাতুল কুরআন, রূহানী খাযায়েন, ৬ষ্ঠ খণ্ড,পৃ: ৩৫৩)

যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, জামাত আহমদীয়ায় ১১৫ বছর থেকে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত আছে। আঁ হযরত (সা.) যে জামাত ও খিলাফতের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকার উপর তাকিদপূর্ণ নির্দেশ দান করেছিলেন, এটিই সেই খিলাফত ও জামাত যার বাইরে থাকার অর্থ অজ্ঞতার মৃত্যু বরণ করা। মুসলমানদের জন্য সেই হাদীসটি প্রণিধানযোগ্য যাতে রসুলুল্লাহ্ (সা.) তাদেরকে একটি জামাতের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকার উপদেশ দিয়েছিলেন। পৃথিবীর বুকে আজ একটি মাত্র অনুরূপ জামাত রয়েছে যেটি জামাত হিসেবে আখ্যায়িত হওয়ার যোগ্য আর সেটি হল জামাত আহমদীয়া। অতএব, মুসলমানদের জন্য এই জামাতের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়া উচিত এবং সেই মেষের ন্যায় জীবন যাপন করা উচিত নয় যেটি দল ছুট হয়ে গেছে, যার কোনও তত্ত্বধায়ক নেই এবং যে সর্বক্ষণ বিপদের মধ্যে থাকে। অতএব, নিম্নে সেই রকম কয়েকটি হাদীসের উল্লেখ করা হচ্ছে যেখানে আঁ হযরত (সা.) জামাতের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকাকে অত্যন্ত জরুরী আখ্যায়িত করেছেন।

● عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ اللّٰهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا حُجَّةَ لَهٗ ، وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِيْ عُنُقِهٖ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً ، وَفِيْ رِوَايَةٍ : مَنْ مَاتَ وَهُوَ مُفَارِقٌ لِلْجَمَاعَةِ فَاِنَّهٗ يَمُوْتُ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً- (مسلم كتاب الْإِمَارَةِ بَابُ الْأَمْرِ بِلُزُوْمِ الْجَمَاعَةِ عِنْدَ ظُهُوْرِ الْفِتَنِ،

হযরত ইবনে উমর (রা.) বর্ণনা করেন,আমি আঁ হযরত (সা.) কে একথা বলতে শুনেছি , যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'লার আনুগত্য থেকে নিজের হাত সরিয়ে নিয়েছে সে (কিয়ামত দিবসে) আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গে এমনভাবে মিলিত হবে যে, তার কাছে কোনও যুক্তি থাকবে না, আর না থাকবে তার কাছে কোনও অজুহাত। আর যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেছে যে, যুগ ইমামের বয়আত করে নি, সে অজ্ঞতা ও পথভ্রষ্টতার মৃত্যু বরণ করেছে। অপর এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, যে- জামাত থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেছে।

বস্তুত যুগ ইমামের বয়আত না করা এবং জামাত থেকে পৃথক থাকা একই বিষয়।

(মুসলিম কিতাবুল ইমারত, বাবুল আমর লি লুযুমুল জামাত ইন্দা জুহুরিল ফিতন')

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন,

'আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি নিজের সর্দার ও নেতার মধ্যে এমন কোনও বিষয় দেখে যা তার পছন্দ নয়, তার ধৈর্য ধারণ করা উচিত। কেননা যে ব্যক্তি জামাত থেকে এক বিঘতও দূরে সরে যায় সে অজ্ঞতার মৃত্যু বরণ করবে।

(বুখারী, কিতাবুল ফিতন)

জুমআর খুতবা

আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-কে প্রেরণ করে ধর্ম ও শরীয়তকে পূর্ণতা দিয়েছেন আর পবিত্র কুরআনে এই ঘোষণা প্রদান করেছেন -

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ اَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَ رَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا

(হযরত মসীহ মওউদ)

আর এই দাবি কেবল ইসলামেরই রয়েছে, অন্য কোনো ধর্মের (এই দাবি) নেই। অর্থাৎ এখন শেষ ধর্ম হলো ইসলাম যা আল্লাহ্ তা'লার মনোনীত ধর্ম।

আল্লাহ্ তা'লা এই ঘোষণা প্রদান করছেন যে, কুরআনী শিক্ষাই এখন মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির একমাত্র মাধ্যম।

মানুষের যা কিছু প্রয়োজন ছিল তা সামগ্রিকভাবে পূর্ণকারী হলো কেবল পবিত্র কুরআন। অর্থাৎ, এমন কোনো (মানবীয়) প্রয়োজন নেই যা পবিত্র কুরআন পরিবেষ্টন করে নি

এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মহানবী (সা.)-এর আগমনের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে গেছে। আর তিনিই সেই কামিল ও শেষ নবী যাঁর প্রতি এই কামিল শরীয়ত অবতীর্ণ হয়েছে। অতএব এটি হলো আমাদের বিশ্বাস আর এতেই আমরা ঈমান রাখি।আর এর জন্য সর্বোত্তম মাধ্যম হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) - এর বই- পুস্তক এবং নির্দেশাবলী।

যদি আমাদের মধ্য হতে প্রত্যেকে এই রমযানে এর প্রতি আমল করার অঙ্গীকার করে এবং পবিত্র কুরআনের শিক্ষার ওপর আমল করার এক দৃঢ় সংকল্প করে নেয় তাহলে যেখানে আমরা নিজেদের আধ্যাত্মিকতায় উন্নতি করবো সেখানে আমাদের সমাজও জান্নাতপ্রতীম সমাজে পরিণত হবে। পারিবারিক ও বংশগত ঝগড়া-বিবাদ যা বিভিন্ন সময়ে দেখা দেয় তা ভালোবাসা ও প্রীতিতে রূপ নিতে পারে।

পবিত্র কুরআনের শিক্ষার মাঝে প্রত্যেক যুগে উদ্ভূত পাপের চিকিৎসা করার বৈশিষ্ট্যও বিদ্যমান রয়েছে। যা আল্লাহ্ তা'লার পুণ্যবান বান্দা ও তফসীরকারকদের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি।

এটি আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ, পবিত্র কুরআনের শিক্ষামালার অনুগ্রহ যে, পবিত্র কুরআনের শিক্ষারমাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা এসব কুপ্রথা বিলুপ্ত করেছেন।

কুরআনের শিক্ষার প্রতি ষোলোআনা আমলকারীগণই অসাধারণ কল্যাণরাজি অর্জন করে– এটিও পবিত্র কুরআনের শিক্ষারই বৈশিষ্ট্য।

প্রত্যেক দিক থেকে কুরআনের কামিল হওয়ার দাবি রয়েছে, আর কেউ এর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে না, আর আজ পর্যন্ত কেউ করতে পারে নি আর ভবিষ্যতেও করতে পারবে না।

পবিত্র কুরআন দরিদ্রদের সদকা দিয়ে থাকে এবং সকল দারিদ্রতা দূর করে বরং নিষ্ঠাবান লোকদের স্বর্ণের ডালি দিয়ে থাকে।

রমযানে জামা'তের বিরুদ্ধবাদীদের অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যও বিশেষভাবে দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক অনিষ্টকারীর হাতকে প্রতিহত করুন এবং তাদেরকে ধৃত করার উপকরণ সৃষ্টি করুন।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ৭ই এপ্রিল, ২০২৩, এর জুমুআর খুতবা (৭ শাহাদত ১৪০২ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহহুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-কে প্রেরণ করে ধর্ম ও শরীয়তকে পূর্ণতা দিয়েছেন আর পবিত্র কুরআনে এই ঘোষণা প্রদান করেছেন যে,

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ اَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَ رَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا

অর্থাৎ আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মকে সম্পূর্ণ করেছি এবং তোমাদের জন্য আমার নিয়ামতকে পরিপূর্ণ করেছি আর ইসলামকে আমি তোমাদের জন্য ধর্মস্বরূপ মনোনীত করেছি। (সূরা আল্ মায়েদা: ৪)

অতএব এটি মুসলমানদের প্রতি আল্লাহ্ তা'লার অনেক বড় অনুগ্রহ যে, তাদের জন্য একটি কামিল বা পূর্ণাঙ্গ শরীয়ত তিনি দান করেছেন। আর এই দাবি কেবল ইসলামেরই রয়েছে, অন্য কোনো ধর্মের (এই দাবি) নেই। অর্থাৎ এখন শেষ ধর্ম হলো ইসলাম যা আল্লাহ্ তা'লার মনোনীত ধর্ম। যদি আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভ করতে হয় তাহলে ইসলাম গ্রহণ করা ছাড়া, এর শিক্ষার ওপর আমল করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।

আল্লাহ্ তা'লা এই ঘোষণা প্রদান করছেন যে, কুরআনী শিক্ষাই এখন মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির একমাত্র মাধ্যম। বরং এই শিক্ষা এতটা পূর্ণাঙ্গ যে, বৈষয়িক উন্নতির বিভিন্ন পথের জন্যও এখন এটিই (একমাত্র) শিক্ষা যা সেদিকে নিয়ে যায়। অতএব

যখন আল্লাহ্ তা'লা এই শিক্ষা সম্পর্কে ***'আকমালতু'*** তথা পরিপূর্ণ হওয়ার ঘোষণা প্রদান করছেন সেখানে এর অর্থ হলো, মানুষের সকল সামর্থ্য-যোগ্যতা, তা নৈতিক হোক বা আধ্যাত্মিক কিংবা দৈহিক, সেগুলো পবিত্র কুরআনের শিক্ষা অনুসরণের মাধ্যমেই অর্জিত হতে পারে। এর পরিপূর্ণ শিক্ষা যদি অনুসরণ করতে হয় তাহলে তা কেবল কেবল পবিত্র কুরআনেই পাওয়া সম্ভব। ***'আতমামতু'*** বলে এই ঘোষণা করেছেন এবং অত্যন্ত জোরালোভাবে করেছেন যে, মানুষের যা কিছু প্রয়োজন ছিল তা সামগ্রিকভাবে পূর্ণকারী হলো কেবল পবিত্র কুরআন। অর্থাৎ, এমন কোনো (মানবীয়) প্রয়োজন নেই যা পবিত্র কুরআন পরিবেষ্টন করে নি, তা মানুষের বৈষয়িক প্রয়োজন হোক বা আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উন্নত মান অর্জনের প্রয়োজন ও পদ্ধতিই হোক না কেন। একজন মানুষ সুবিচারের দৃষ্টিতে যা-ই দেখতে চায় তা পবিত্র কুরআনের শিক্ষায় বিদ্যমান রয়েছে। অতএব এই আয়াতের সাথে পবিত্র কুরআন এই ঘোষণা করেছে যে, এখন মানুষের স্থায়িত্ব এই শিক্ষার সাথেই সম্পৃক্ত। আর এই শিক্ষা সকল যুগ ও পুরো বিশ্বের মানুষের জন্য। আর পবিত্র কুরআনের পূর্বে অবতীর্ণ সকল শিক্ষা, যা বিভিন্ন নবীর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে সেগুলো সাময়িক এবং সেই যুগের জন্য (নির্ধারিত) ছিল, তা পুরো মানব জাতির জন্য ছিল না।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এটি স্পষ্ট করতে গিয়ে এই ঘোষণাও করেন যে, এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মহানবী (সা.)-এর আগমনের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে গেছে। আর তিনিই সেই কামিল ও শেষ নবী যাঁর প্রতি এই কামিল শরীয়ত অবতীর্ণ হয়েছে। অতএব এটি হলো আমাদের বিশ্বাস আর এতেই আমরা ঈমান রাখি।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি আপত্তিকারীরা এই আপত্তি করে যে, এই বিশ্বাসই যদি থাকে আর পবিত্র কুরআনকে যদি শেষ শরীয়ত ও মহানবী (সা.)-কে শেষ নবী মান্য করেন তাহলে তাঁর দাবির বাস্তবতা বা প্রয়োজন কী? অর্থাৎ, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দাবি তাহলে কী? আর এই যুগে তাঁর আগমনের প্রয়োজনই বা কী ছিল? এর বিভিন্ন উত্তর রয়েছে এক জায়গায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এভাবে এর উত্তর দিয়েছেন যে, যদি তোমরা ইসলামী শিক্ষার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে তাহলে একথা সঠিক যে, আমার আগমনের কোনো প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু যুগের সার্বিক অবস্থা আর বিশেষত মুসলমানদের নিজেদের অবস্থা এ কথা ঘোষণা করছে যে, কোনো শিক্ষকের প্রয়োজন রয়েছে।

এরপর এই শিক্ষাকে ভুলে যাওয়া সম্পর্কে স্বয়ং মহানবী (সা.) বলেছিলেন আর এর সংশোধনের জন্য প্রত্যেক শতাব্দীতে মুজাদ্দিদ আসার কথা বলেছেন, ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। অর্থাৎ মুসলমানরা পবিত্র কুরআনের শিক্ষা পরিপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও এই শিক্ষাকে ভুলে যাবে। তাদের মাঝে নতুন নতুন বিদআত সৃষ্টি হবে। এ কারণে ধর্মের সংস্কারের জন্য মুজাদ্দিদগণের আগমন হতে থাকবে। আর শেষ যুগে মসীহ্ মওউদ ও প্রতিশ্রুত মাহদী আগমন করবেন, যিনি ধর্মকে সুরাইয়্যা (নক্ষত্র) থেকে ধরাপৃষ্ঠে নিয়ে আসবেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নিজের সাহিত্যে, রচনাবলীতে, বইপুস্তকে এক কথায় সকল স্থানে এটি বলেছেন যে, আমি মহানবী (সা.)- এর দাসত্বে তাঁর শরীয়ত ও ধর্ম এবং পবিত্র কুরআনের শিক্ষাকে পৃথিবীতে প্রচারের জন্য এসেছি। আর এখন যেহেতু মহানবী (সা.)- এর মাধ্যমে ধর্ম পরিপূর্ণতা লাভ করেছে তাই এটিকে এবং এর শিক্ষাকেই পৃথিবীর সকল প্রান্তে পৌঁছে দিতে এসেছি। অর্থাৎ, শিক্ষার পূর্ণতা মহানবী (সা.)- এর প্রতি পবিত্র কুরআনের অবতরণের মাধ্যমে হয়েছে। আর সেই যুগে যেহেতু শরীয়ত ও শিক্ষা প্রচারের উপকরণ সহজলভ্য ছিল না তাই এর প্রচারের জন্য বর্তমান যুগে স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)- এর নিষ্ঠাবান দাসকে প্রেরণ করেছেন। অতএব এটিই সেই কাজ যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সম্পাদন করেছেন আর এটিকেই চলমান রাখার জন্য আহমদীয়া জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর এটিই সেই কাজ যা আহমদীয়া জামা'ত তাঁর (আ.) রচিত সাহিত্য এবং তাঁর বর্ণিত কুরআনের তফসীর অনুযায়ী করে যাচ্ছে। আর এই বিষয়ে প্রত্যেক আহমদীর প্রণিধান করা উচিত যে, উক্ত উদ্দেশ্যকে আমরা কতটা বাস্তবায়িত করছি । সামগ্রিকভাবে প্রোগ্রাম হচ্ছে, কার্যক্রম চলছে কিন্তু ব্যক্তিগত পর্যায়েও তা হওয়া উচিত।

অতএব আমাদের বয়আতের উদ্দেশ্য তখনই অর্জিত হবে যখন আমরা এই উদ্দেশ্যকে নিজেদের দৃষ্টিপটে রাখব। এর জন্য আমাদের পবিত্র কুরআন পাঠ এবং তা অনুধাবনের প্রতি সর্বদা মনোযোগী থাকা প্রয়োজন। আর এর জন্য সর্বোত্তম মাধ্যম হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) - এর বই- পুস্তক এবং নির্দেশাবলী।

পবিত্র কুরআনের সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্যাবলী আমি কিছুকাল যাবৎ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর রচনাবলীর আলোকে বর্ণনা করছি। আজও পবিত্র কুরআনের শিক্ষার পরিপূর্ণ হওয়ার বিষয়ে তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করব। اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ اَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَ رَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا (সূরা আল্ মায়েদা: ৪)। অর্থাৎ, আজ আমি তোমাদের ধর্মকে তোমাদের জন্য পরিপূর্ণ করে দিয়েছি আর তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামতকে সম্পূর্ণ করেছি। আর আমি ইসলামকে তোমাদের ধর্ম মনোনীত করে সন্তুষ্ট হয়েছি। অতএব পবিত্র কুরআনের পর আর কোনো (ঐশী) গ্রন্থ আসার সুযোগ নেই, কেননা মানুষের যতটা প্রয়োজন ছিল তার সবকিছুই পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। এখন কেবল খোদার সাথে বাক্যালাপের দ্বার উন্মুক্ত রয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা বান্দাদের সাথে কথা বলেন, সেই দ্বার উন্মুক্ত আছে। নতুন কোনো শিক্ষা নেই। আর তা-ও আপনাআপনি উন্মুক্ত হয়নি। বরং সত্য এবং পবিত্র বাক্যালাপ যা স্পষ্ট এবং প্রকাশ্যভাবে ঐশী সাহায্যের বৈশিষ্ট্য নিজের মাঝে ধারণ করে এবং বহু অদৃশ্যের সংবাদ সংবলিত হয়। তা আত্মশুদ্ধির পর কেবলমাত্র পবিত্র কুরআনের অনুসরণ এবং মহানবী (সা.)-এর আনুগত্যের মাধ্যমেই লাভ হয়। এটি যেহেতু কামিল গ্রন্থ তাই এখন এর অনুসরণ এবং মহানবী (সা.)-এর পূর্ণ আনুগত্যের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্কে র এই পথ উন্মুক্ত হয়েছে। এছাড়া আর কোনো পথ নেই, কোনো মাধ্যম নেই। আর তিনি (আ.) বলেছেন, আমিও এ কারণেই এই পদমর্যাদা লাভ করেছি।

এরপর পবিত্র কুরআন যে কামিল হিদায়াত বা পথনির্দেশনা সে সম্পর্কে তিনি (আ.) অন্যত্র আরো বলেন, পবিত্র কুরআন শুধু এতটুকুই চায় না যে, মানুষ কেবল পাপ বা অনিষ্ট পরিত্যাগ করেই মনে করবে যে, এখন আমি পুণ্যবান হয়ে গেছি বা কামেল হয়ে গেছি। মন্দকর্ম পরিত্যাগ করলেই পরাকাষ্ঠা অর্জিত হয়ে যায়না বরং এটি তো মানুষকে উন্নতমানের পরাকাষ্ঠা এবং শ্রেষ্ঠ নৈতিক গুণে গুণান্বি ত করতে চায়। পবিত্র কুরআন শুধুমাত্র পাপমুক্ত করাতেই চায়না বরং (মানু ষের মাঝে) সুমহান ও শ্রেষ্ঠ গুণাবলী এবং উন্নত নৈতিক গুণ সৃষ্টি করতে চায়। অর্থাৎ মন্দকর্মসমূহও পরিত্যাগ করতে হবে এবং তদস্থলে উন্নত নৈতিক চরিত্রও অবলম্বন করতে হবে। অর্থাৎ তার হাতে যেন এমন কাজকর্ম সম্পাদিত হয় যা মানবতার কল্যাণ এবং সহানুভূতি নিয়ে হয় আর এর ফলাফল যা দাঁড়াবে তা হলো, আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। এই ফলাফল প্রকাশ পাওয়া উচিত যে, আল্লাহ্ তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন।

অতএব পবিত্র কুরআনের শিক্ষানুযায়ী আমাদের মাঝে এমন চিন্তা-চেতনা সৃষ্টি হওয়া উচিত। আমাদের আত্মজিজ্ঞাসা করা উচিত যে, আমাদের মাঝে এই চিন্তা-চেতনা রয়েছে কী? আমরা কি অন্যদের মতো শুধুমাত্র (কুরআন) পড়ার দাবি করছি না-কি সত্যিকার অর্থেই এসব পরিবর্তনও সৃষ্টি হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'লার সাথে আমাদের বিশেষ সম্পর্ক সৃষ্টি হচ্ছে।

রমযান মাসেও পবিত্র কুরআন পড়া হয়, দরসও শোনা হয়। কাজেই একে (নিজেদের) জীবনে প্রয়োগ করাও আবশ্যক। আর আমরা তো নিজেদের বয়আতের শর্তেও এই অঙ্গীকার করেছি অর্থাৎ বয়আতের দশটি শর্তে একথা লিখা আছে যে, পবিত্র কুরআনের অনুশাসন ষোলোআনা শিরোধার্য করবো।"

(ইযালায়ে আওহাম, রূহানী খাযায়েন, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৫৬৪)

অতএব যদি আমাদের মধ্য হতে প্রত্যেকে এই রমযানে এর প্রতি আমল করার অঙ্গীকার করে এবং পবিত্র কুরআনের শিক্ষার ওপর আমল করার এক দৃঢ় সংকল্প করে নেয় তাহলে যেখানে আমরা নিজেদের আধ্যাত্মিকতায় উন্নতি করবো সেখানে আমাদের সমাজও জান্নাতপ্রতীম সমাজে পরিণত হবে। পারিবারিক ও বংশগত ঝগড়া-বিবাদ যা বিভিন্ন সময়ে দেখা দেয় তা ভালোবাসা ও প্রীতিতে রূপ নিতে পারে।

ঐশী শরীয়তের বীজ পবিত্র কুরআনের যুগে স্বীয় উৎকর্ষতায় পৌঁছে গিয়েছিল, এ বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে {তিনি (আ.)} বলেন,

"যেহেতু পবিত্র কুরআন সৎকর্মের আদেশ এবং মন্দকাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ প্রদানের ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গীন গ্রন্থ। করণীয় সম্পর্কে দিকনির্দেশনা প্রদানে এবং নিষিদ্ধ কাজ সম্পর্কে বর্ণনার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ। ষোলোআনা বাতলে দিয়েছে যে, কি করতে হবে আর কি করা যাবে না। আর এক্ষেত্রে খোদা তা'লার অভিপ্রায় হলো, মানবীয় প্রকৃতিতে যেসব চরম বিকৃতি দেখা দিতে পারে আর ভ্রষ্টতা ও অপকর্মে র ক্ষেত্রে সে যতটা অগ্রসর হতে পারে; পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে সেসব অপকর্মের সংশোধন; তাই এমন সময়ে তিনি পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ করেছেন যখন মানবজাতির মাঝে এসব মন্দকর্ম বা বিকার সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল আর ধীরে ধীরে মানবপ্রকৃতি সকল প্রকার মন্দ বিশ্বাস ও অপকর্মে কলুষিত হয়ে গিয়েছিল। আর এটিই ঐশী প্রজ্ঞার দাবি ছিল অর্থাৎ এমন সময়েই যেন তাঁর পূর্ণ শিক্ষা বা কামেল কিতাব অবতীর্ণ হয়। কেননা পাপ প্রকাশিত হওয়ার পূর্বেই সেসব মানুষকে সেসব অপরাধ ও মন্দবিশ্বাস সম্পর্কে অবহিত করা যেগুলো সম্পর্কে তারা একেবারেই অনবহিত, তা যেন তাদেরকে পাপের দিকে আকৃষ্ট করারই নামান্তর। আগেই বলে দেওয়া যে, এই এই পাপ রয়েছে, যা (তারা) জানেই না, যেগুলো সম্পর্কে কোনো ধারণাই নাই; এগুলোর মাধ্যমে তো পাপ বিস্তার লাভ করে। বর্তমানে আমরা এটিই দেখছি যে, শিক্ষা ব্যবস্থায় শিশুদেরকে এমন যৌন সম্পর্কের কথা অবহিত করা হয়, যে বিষয়ে শিশুদের কোনো ধারণাই নেই। এতে তারা উৎকণ্ঠিত ও হতভম্ব হয়। এখন তো পিতামাতারাও বলতে আরম্ভ করেছে যে, এগুলো কি পড়ানো হচ্ছে! বরং শিক্ষাবিভাগও এ বিষয়টিকে খতিয়ে দেখছে। কোনো কোনো শিক্ষক (এক্ষেত্রে) সীমা ছাড়িয়ে গেছে। অর্থাৎ এমনসব বিষয় যেগুলো সম্পর্কে (শিশুরা) জানেই না, তারা (অথাৎ শিক্ষকরা) স্বয়ং তাদের মধ্যে (তা) সৃষ্টি করছে যা মূলত সাবালক বা প্রাপ্ত বয়সে উপনীত হওয়ার পর তাদের জানার কথা। আর এটিই মানব রচিত বিধান এবং শরীয়তের বিধানের মাঝে (মূল) পার্থক্য। এটিই (মানব রচিত) আইন ও পবিত্র কুরআনের নির্দেশনার মধ্যে পার্থক্য। অর্থাৎ পবিত্র কুরআন নির্দেশনা প্রদান করে এবং স্পষ্ট করে বলে দেয় যে, এই বয়সের (শিশুর) জন্য এই হলো নির্দে শনা এবং এই বয়সের (মানুষের) জন্য এই আদেশ। এমন নয় যে, সবকিছু একেবারেই প্রকাশ করে দিয়েছে। এরপর সেসব বাক্যাবলী থেকেই ধীরে ধীরে প্রত্যেকের বিবেক ও বুদ্ধি অনুযায়ী তফসীর বা ব্যাখ্যা সামনে আসতে থাকে।

তিনি (আ.) বলেছেন, অতএব হযরত আদমের মাধ্যমে খোদার ওহীর বীজ বোপিত হওয়া আরম্ভ হয় এবং খোদা তা'লার শরীয়ত (অর্থাৎ) পবিত্র কুরআনের যুগে সেই বীজ পূর্ণতা লাভ করে এক বিশাল বৃক্ষে পরিণত হয়েছে।"

(চাশমায়ে মারেফাত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২৩, পৃ: ২১৯-২২০)

যেভাবে পাপ বিস্তার লাভ করতে থাকে, এর চিকিৎসাও যুগের নিরিখে প্রকাশিত হতে বা অবতীর্ণ হতে থেকেছে। আর পবিত্র কুরআনের শিক্ষার মাঝে প্রত্যেক যুগে উদ্ভূত পাপের চিকিৎসা করার বৈশিষ্ট্যও বিদ্যমান রয়েছে। যা আল্লাহ্ তা'লার পুণ্যবান বান্দা ও তফসীরকারকদের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি।

পুনরায় {তিনি (আ.)} বলেন, যেহেতু কামেল বা পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ এসে সংশোধন করার কথা তাই এই কিতাবের অবতীর্ণ হওয়ার সময় তার অবতরণ স্থলে (আধ্যাত্মিক) ব্যাধিও চরমরূপে বিরাজমান থাকা আবশ্যক ছিল, যাতে প্রত্যেক রোগের পরিপূর্ণ চিকিৎসা প্রদান করা যায়। অতএব সেই (আরব) উপদ্বীপ চরম (আধ্যাত্মিক) ব্যাধিতে আক্রান্ত ছিল। যাদের মধ্যে সেসব আধ্যাত্মিক রোগ বিরাজ করছিল, অর্থাৎ আরবে। যাতে তৎকালীন কিংবা পরবর্তী প্রজন্ম আক্রান্ত হওয়ার ছিল। এখানে আরো স্পষ্ট হয়ে যায় অর্থাৎ যা তখন বিদ্যমান ছিল অথবা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মাঝে দেখা দেওয়া অবশ্যম্ভাবী ছিল, সেই শিক্ষা দিয়ে দেন। কেননা যুগ (বেশি) দূরে যাওয়ার ছিল না, শরীয়ত পূর্ণতা লাভ করছিল তাই ভবিষ্যতে যা কিছু ঘটতে পারতো তাও স্পষ্ট করে দেয় আর বলে দেয় যে, কতটা প্রকাশ করবে এবং কতদূর প্রকাশ করবে। এ কারণেই তফসীরকারকগণ যুগের নিরিখে ব্যাখ্যা করতে থাকেন। {তিনি (আ.)}বলেন, এ কারণেই পবিত্র কুরআন সকল শরীয়তকে সম্পূর্ণ করেছে। অন্যান্য গ্রন্থ অবতীর্ণ হওয়ার সময় এই প্রয়োজনীয়তা ছিল না আর সেগুলোতে এমন পরিপূর্ণ শিক্ষাও ছিল না।"

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৮)

তিনি (আ.) এখানে এটি প্রমাণ করেন যে, স্বয়ং খ্রিষ্টান ও ইহুদীরা ও এ বিষয়টি স্বীকার করে যে, যুগ সকল অর্থে চরমভাবে বিকৃত হয়ে গিয়েছিল আর তখন একটি শরীয়তের প্রয়োজন ছিল।

পবিত্র কুরআন কখনোই কোনো মানবীয় বাণীর সদৃশ হতে পারে না, এই বিষয়টি বুঝাতে গিয়ে উদাহরণস্বরূপ তিনি (আ.) বলেন, যখন কতেক বক্তা ও সুলেখক নিজেদের জ্ঞানের বলে একটি প্রবন্ধ লিখতে চায়। (অর্থাৎ বাকপটু কিংবা সুলেখক যদি নিজেদের জ্ঞানের শক্তিতে এমন কোনো প্রবন্ধ রচনা করতে চায়) যা অত্যুক্তি, মিথ্যা, অতিশয় সংযোজন, অনর্থক, অপলাপ এবং সকল নিরর্থক বক্তব্য, অগোছালো ভাষা এবং প্রাঞ্জলতা বহির্ভূত এবং শ্রেষ্ঠত্ব ও সম্পূর্ণতা পরিপন্থী ব্যাধি হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হতে হবে। (অর্থাৎ একজন সুলেখক সকল প্রকার মিথ্যা মনগড়া বক্তব্য, অযথা কথাবার্তা, অপলাপ, হাসি-ঠাট্টা ইত্যাদি এবং সকল প্রকার অর্থহীন ও বাজে কথাবার্তা এবং বিভ্রান্তি কর জটিল কথাবার্তা যা মানুষের বোধগম্যই হয় না, এবং এমনসব প্রজ্ঞাশূন্য এবং প্রাঞ্জলতা বহির্ভূত কথাবার্তা থেকে মুক্ত বিষয় লিখতে চেষ্টা করে।) এগুলোই একজন সুলেখকের বৈশিষ্ট্য, অর্থাৎ সকল প্রকার বাজে বিষয় থেকে তার রচনা মুক্ত ও পবিত্র হবে। আর ষোলোআনা সত্য, প্রজ্ঞা, বাগ্মিতা, সুস্পষ্টতা, সত্য ও তত্ত্বজ্ঞানে সমৃদ্ধ হবে। কাজেই, এমন প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে সেই ব্যক্তিই সর্বাগ্রে থাকবে যে জ্ঞানশক্তি, জ্ঞানের ব্যাপকতা এবং সবকিছুর ওপর যার সার্বিক দৃষ্টি রয়েছে এবং সূক্ষ্ম জ্ঞানগর্ভ বিষয়ে নৈপুণ্যে সবার চেয়ে উন্নত এবং বক্তৃতা ও লেখনীর ক্ষেত্রে যুগে সর্বাধিক দক্ষ ও অভিজ্ঞ। (অর্থাৎ যে খুব ভালো লেখাপড়া জানা শিক্ষিত এবং অভিজ্ঞ হবে সে ব্যক্তিই এমন প্রবন্ধ লিখতে পারে।) অর্থাৎ যে এসব দুর্বলতা থেকে পবিত্র বা মুক্ত হবে। যে ব্যক্তি সামর্থ্য ও যোগ্যতায়, জ্ঞানে, গুণে, দক্ষতায় মেধায় ও বুদ্ধিতে তার চেয়ে অনেক নিম্নমানের, আর অধঃপতিত সে রচনার শ্রেষ্ঠত্বের দিক থেকে তার সমপর্যায়ের হতে পারে না। (অর্থাৎ যার মধ্যে এসব যোগ্যতা নেই সে কোনোভাবেই তার সমপর্যায়ের হতে পারে না।) তিনি (আ.) বলেন, যেমন একজন দক্ষ ডাক্তার যে চিকিৎসাশাস্ত্রে পূর্ণ দক্ষতা রাখে। একজন অভিজ্ঞ ডাক্তার যে দক্ষতা রাখে যার দীর্ঘকালের পেশাদারিত্বের কল্যাণে রোগ নির্ণয়ও রোগ নিরূপনের পূর্ণ জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা রয়েছে অর্থাৎ সঠিকভাবে রোগ নির্ণয় করে নেয়। রোগ সম্পর্কেও তার পূর্ণাঙ্গীণ জ্ঞান রয়েছে। তাছাড়া কথায় ও বক্তৃতায় সে অনন্য- বাড়তি একটি বৈশিষ্ট্য তার মাঝে রয়েছে বা বাকপটুতা রাখে এছাড়া পদ্য ও গদ্যে যুগে শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ খুবই ভালো। যেভাবে সে একটি রোগের সূত্রপাতের অবস্থা এবং তার লক্ষণ এবং উপসর্গ খুবই উন্নত ভাষায়, অত্যন্ত সঠিক ও বস্তুনিষ্ঠ ভাষায়, যথাযথরূপে ও প্রাঞ্জলভাবে বর্ণনা করতে পারে। তার তুলনায় অন্য কেউ যার চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাথে বিন্দুমাত্র সম্পর্কও নেই এবং কথা বলার স্পর্শকাতর দিকগুলো সম্পর্কেও যে অজ্ঞ সে তার মতো বর্ণ না করবে- তা কখনোই সম্ভব নয়। যে ব্যক্তির মাঝে এসব বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় না সে এসব বিষয় কোনোভাবেই বর্ণনা করতে পারে না। অর্থাৎ একজন জ্ঞানী মানুষ যার নিজের পেশায়ও দক্ষতা রয়েছে তাছাড়া কথাও সুন্দরভাবে প্রকাশ করতে পারে এবং গবেষণাও ভালো করে,সে যেভাবে বর্ণনা করতে পারবে তার বিপরীতে সীমিত জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তি তেমনটি করতে পারে না। তার মর্যাদা তার চেয়ে অবশ্যই উন্নত পর্যায়ের। তিনি (আ.) বলেন, এ বিষয়টি একেবারে স্পষ্ট ও সর্বজনবিদিত যে, অজ্ঞ ও জ্ঞানীর বক্তৃতায় অবশ্যই কিছু না কিছু পার্থক্য থাকে এবং মানুষ যতটুকু জ্ঞানে শ্রেষ্ঠত্ব রাখে, স্বভাবতই তার জ্ঞানের গভীরতা তার জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতায় সেভাবে ফুটে উঠে যেভাবে কোনো স্বচ্ছ আয়নায় চেহারা দেখা যায়। আর সত্য ও প্রজ্ঞা বর্ণনা করার সময় তার মুখ থেকে যে শব্দাবলী নিঃসৃত হয় তা তার জ্ঞানগত যোগ্যতা অনুমান করার জন্য একটি মাপকাঠি হয়ে থাকে। আর যে কথা জ্ঞানের ব্যাপকতাও বুদ্ধির উৎকর্ষতা থেকে উৎসারিত হয় আর যে কথা সংকীর্ণ ও অসার এবং অন্ধকার ও সীমাবদ্ধ চিন্তাধারা থেকে উদ্ভূত হয়- এ উভয় প্রকার কথার মাঝে কতই না পার্থ ক্য রয়েছে। একটি হলো জ্ঞান ও প্র জ্ঞার ঝরনা আর একটি হলো নিতান্তই ভাসাভাসা (বা সারশূন্য) কথা, এ উভয়ের মধ্যকার সুস্পষ্ট পার্থ ক্য সহজেই বুঝা যায়। তিনি (আ.) বলেন, পার্থ ক্য স্পষ্ট বুঝা যায়, যেমন ঘ্রাণশক্তির সামনে কোনো প্রকৃতিগত বা সাময়িক বিপত্তি যদি না থাকে তাহলে সুগন্ধ ও দুর্গন্ধের মাঝে পার্থক্য একেবারে সুস্পষ্ট হয়ে থাকে। তুমি যতটা পারো চিন্তা করে দেখো এবং যত পারো ভাবো, এই সত্যের কোনো ব্যতিক্রম দেখবে না। এটি নিটোল সত্য কথা এবং কোনো দিক থেকে এতে কোনো বিপত্তি দেখতে পাবে না। অতএব যেখানে সর্বদিক থেকে এটি প্রমাণিত যে, জ্ঞান ও বুদ্ধিশক্তির মাঝে যে পার্থক্য সুপ্ত বা প্রচ্ছন্ন থাকে তা কথার মাঝে অবশ্যই প্রকাশ পায়, এটি কোনোভাবেই সম্ভব নয় যে, জ্ঞান ও বুদ্ধির বিবেচনায় যারা উন্নত ও উচ্চ পর্যায়ের হয়ে থাকে তারা বাগ্মিতা ও রূপকের ব্যবহারে অন্যদের সমান হয়ে যাবে। জ্ঞানী ও বুদ্ধিমানরা অবশ্যই উন্নত পর্যায়ে থাকবে, তারা একজন সাধারণ মানুষের সমপর্যায়ের হবে না। আর উভয়ের মাঝে কোনো স্বাতন্ত্র্য থাকবে না তা হতে পারে না। এই সত্যতা প্রমাণিত হওয়া দ্বিতীয় অপর এক সত্যতার প্রমাণ বহন করে অর্থাৎ ঐশী বাণী সর্বদা মানুষের বাণীর তুলনায় বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ গুণ-বৈশিষ্ট্যে শ্রেষ্ঠ ও উন্নত এবং অতুলনীয় হওয়া আবশ্যক।"

অতএব এই উদাহরণ থেকে এটি প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ তা'লার বাণী অন্য সব কিছুর চেয়ে উন্নত। আল্লাহ্ তা'লাই সকল জ্ঞানকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন। তার মতো জ্ঞান তো কারো নেই। কেননা কারো জ্ঞান খোদার পরিপূর্ণ জ্ঞানের সমপর্যায়ের হতে পারে না আর এদিকেই ইঙ্গিত করে খোদা বলেছেন, فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ (সূরা হূদ: ১৫)। অর্থাৎ, যদি কাফিররা এই কুরআনের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন না করতে পারে আর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে তোমরা জেনে রাখো এই কালাম খোদার জ্ঞানে নাযিল হয়েছে, মানুষের জ্ঞানে নয়।" যদি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে না পারে তাহলে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, এটি মানুষের নয় বরং খোদার বাণী। "যার ব্যাপক ও পরিপূর্ণ জ্ঞানের বিপরীতে মানবীয় জ্ঞান অন্তঃসারশূন্য ও অর্থহীন। এই আয়াতে অবরোহ যুক্তির আদলে প্রভাবকে প্রভাব বিস্তারীর অস্তিত্বের প্রমাণ আখ্যায়িত করা হয়েছে। তিনি (আ.) বলেন, "ভিন্নভাবে বললে সার কথা এটি দাঁড়াবে যে, ঐশী জ্ঞান স্বীয় শ্রেষ্ঠত্ব ও পূর্ণতায় মানুষের ত্রুটিপূর্ণ জ্ঞানের সাথে কখনো সাদৃশ্যপূর্ণ হতে পারে না। বরং যে বাণী এই পরিপূর্ণ ও অতুলনীয় জ্ঞান থেকে নিঃসৃত হয়েছে সেটাও পুর্ণাঙ্গীন ও অনন্য হওয়া এবং মানুষের বাণী থেকে পূর্ণ রূপে স্বতন্ত্র হওয়া বাঞ্ছনীয়। অতএব পবিত্র কুরআনে এই শ্রেষ্ঠত্বই প্রমাণিত। "

(বারাহীনে আহমদীয়া, রূহানী খাযায়েন, ১ম খণ্ড, পৃ: ২১৬)

কাজেই প্রত্যেক দিক থেকে কুরআনের কামিল হওয়ার দাবি রয়েছে, আর কেউ এর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে না, আর আজ পর্যন্ত কেউ করতে পারে নি আর ভবিষ্যতেও করতে পারবে না।

তিনি (আ.) বলেন, "পবিত্র কুরআন যেভাবে একজনকে জ্ঞানগত সর্বোচ্চ মার্গে উপনীত করে তেমনিভাবে কর্মগত পরম মার্গও এরই মাধ্যমে লাভ হয়। আর এক আল্লাহ্র সন্নিধানে গ্রহণীয় হওয়ার চিহ্ন ও জ্যোতি তাদের মাঝেই প্রকাশিত হয়ে আসছে এবং এখনও প্রকাশিত হয়, যারা এই পবিত্র বাণীর অনুসরণ করেছে। এছাড়া অন্যদের মাঝে কখনোই প্রকাশিত হয় না। অতএব সত্যান্বেষীদের জন্য এই প্রমাণই যথেষ্ট যা সে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করতে পারে, আর তা হলো; ঐশী কল্যাণরাজি ও খোদার নিদর্শন শুধুমাত্র পবিত্র কুরআনের কামিল অনুসারীদের মাঝেই দৃষ্টিগোচর হয়।"

(বারাহীনে আহমদীয়া, রূহানী খাযায়েন, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৫১-৩৫২, ১১ নম্বর টিকা)

পবিত্র কুরআনের পরিপূর্ণ অনুসরণ করলেই নিদর্শনাবলীও দেখতে পাবে। লোকেরা প্রশ্ন করে, আমরা তো নিদর্শন দেখলাম না বা এত দিন দোয়া করেছি কিন্তু দোয়া গৃহীত হয় নি। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, এজন্য প্রথমে আমার কথা শোনো, আমার প্রতি পূর্ণ ঈমান রাখো, আমার আদেশ পালন করো। যখন এমনটি করবে তখন আল্লাহ্ তা'লা দোয়াও শোনেন।

অতএব কুরআনের শিক্ষার প্রতি ষোলোআনা আমলকারীগণই অসাধারণ কল্যাণরাজি অর্জন করে- এটিও পবিত্র কুরআনের শিক্ষারই বৈশিষ্ট্য। তিনি (আ.) বলেন, পবিত্র কুরআন পরম সংক্ষিপ্ত পরিসরে সকল ধর্মীয় সত্যকে পরিবেষ্টন করেছে। মু'জিযা নয় বরং আলিফ-ইয়ে-জিম দিয়ে এজায, যার অর্থ সংক্ষিপ্ত কিন্তু গভীর অর্থবহ বিষয়বস্তু।

এটি বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, পবিত্র কুরআন স্বীয় বাগ্মিতা ও প্রাঞ্জলতাকে- সত্য, প্রজ্ঞা ও প্রকৃত প্রয়োজনের দৃষ্টিকোণ থেকে বর্ণনা করেছে। পরম সংক্ষেপণের নৈপুণ্যে ধর্মী য় সকল সত্যকে পরিবেষ্টন করে দেখিয়েছে। এতে সকল বিরোধী ও অস্বীকারকারীকে নির্বাক করার জন্য অজস্র সমুজ্জ্বল যুক্তি প্রমাণ বিদ্যমান। আর মু'মিনদের বিশ্বাসের দৃঢ়তার জন্য হাজার হাজার গুঢ়তত্ত্বের ও সত্যের একটি গভীর ও স্বচ্ছ সমুদ্র এতে প্রবহমান দেখা যায়। যেসব বিষয়ে বিশৃঙ্খলা

দেখেছে সেগুলোর সংশোধনের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছে। যে তীব্রতার সাথে কোনো বাড়াবাড়ি ও শৈথিল্য প্রাধান্য বিস্তার করেছে অনুরূপ তীব্রতার সাথে সেটিকে প্রতিহতও করেছে। যত প্রকার ব্যাধি বিস্তৃত দেখেছে সেগুলোর চিকিৎসাপত্র প্রস্তাব করেছে। মিথ্যা ধর্মগুলোর প্রত্যেক সন্দেহের নিরসন করেছে। মিথ্যা ধর্মগুলো যেসব প্রশ্ন উত্থাপন করে, তাদের যে সন্দেহ রয়েছে সেগুলোকে দূরীভূত করেছে। প্রত্যেক আপত্তির উত্তর দিয়েছে। এমন কোনো সত্য নেই যা বর্ণনা করে নি। প্রত্যেক ভ্রষ্ট ফিরকার অপনোদন লিপিবদ্ধ করেছে।" পথভ্রষ্ট লোকদের খণ্ডনে কথা বলেছে। প্রত্যেক বিষয়ে সুস্পষ্ট বিধান রয়েছে। "আর পরাকাষ্ঠা হলো এমন কোনো কথা নেই যা অপ্রয়োজনে লিখেছে। কোনো কথা অযথা বর্ণনা করে নি। আর কোনো অপ্রাসঙ্গিক কথা বলেনি। আর কোনো কথা বৃথা বলা হয়নি এসব বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখার পাশাপাশি বাগ্মিতার ক্ষেত্রে নিজের সেই মর্যাদা প্রতিভাত করেছে যার চেয়ে বেশি কল্পনাও করা যায় না। সমস্ত বিষয় সংক্ষেপে সন্নিবেশন করেছে। কিন্ত প্রাঞ্জলতা ও বাগ্মিতা এমন যে, এর চেয়ে উন্নত ভাবাই যায় না এবং প্রাঞ্জলতাকে এমন উৎকর্ষতায় পৌঁছিয়েছে যে, পরম আকর্ষণীয় বিন্যাস, সংক্ষিপ্ত ও প্রামাণ্য বর্ণনার মাধ্যমে পূর্বাপরের (সমস্ত) জ্ঞানকে একটি সংক্ষিপ্ত পুস্তকে সন্নিবেশিত করেছে। পূর্ববর্তী লোকদের জন্যও এটি জ্ঞানভাণ্ডার ছিল, পূর্বেই দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছি; হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, আরবের যারা মরুবাসী, গ্রাম্য ছিল তারাও কুরআন বুঝেছে এবং তারা খোদাপ্রেমিক মানুষে পরিণত হয়েছে, শিক্ষিত মানুষে রূপান্ত রিত হয়েছে আর যারা জ্ঞানী ছিল তারাও নিজেদের জ্ঞান অনুযায়ী অনুধাবন করেছে আর এরপর শুধু তাদেরকেই নয় বরং আদ্যান্তের সকলকেই। শেষ যুগ অর্থাৎ শেষ যুগের লোকদের কাছেও পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এমনই যে, প্রত্যেক যুগে যার তফসীর হচ্ছে; এর প্রতিটি শব্দের নতুন নতুন অর্থ প্রকাশিত হচ্ছে যা যুগের নিরিখে আমাদের কাছে বোধগম্য হয়। তিনি (আ.) বলেন, একটি সংক্ষিপ্ত পুস্তকে এসব কিছু সন্নিবেশিত করেছেন যেন মানুষ যার জীবন স্বল্প এবং কাজ অনেক, সে অসংখ্য সমস্যা থেকে পরিত্রাণ পায় এবং এ বাগ্মিতার মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয় প্র চার-প্রসারে যেন ইসলাম উপকৃত হয় এবং মুখস্থ করা বা স্মরণ রাখাও সহজ হয়।" (বারাহীনে আহমদীয়া, রূহানী খাযায়েন, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৫১-৪৫৬, টিক নম্বর-৩)

মানুষ পবিত্র কুরআন মুখস্ত করে, শিশুরাও স্বল্প বয়সে মুখস্ত করে ফেলে। তিনি (আ.) তাঁর পুস্তক বারাহীনে আহমদীয়াতে এটি প্রমাণ করেছেন যে, পবিত্র কুরআনইসেই কিতাব যা স্বীয় বাক্যাবলী এবং ভাষার নিরিখে এমন সত্যতা বর্ণনা করে যা অন্য কোথায় পাওয়া যায় না আর ইঞ্জিল প্রভৃতি কিতাবসমূহ তো মানবীয় হস্তক্ষেপের কারণে এখন আর ঐশী গ্রন্থ হিসেবেই গণ্য হয় না।

পুনরায় তিনি (আ.) পবিত্র কুরআনের ভাষাগত সংক্ষিপ্ততার শ্রেষ্ঠত্বের কথা আরেক স্থানে এভাবে বর্ণনা করেন যে, যখন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি পবিত্র কুরআনের প্রতি অভিনিবেশ করবে, তাৎক্ষণিকভাবে সে অনুধাবন করবে যে, পবিত্র কুরআন ভাষাগত সংক্ষিপ্ততায় বাগ্মিতার অপরিহার্য ও প্রয়োজনীয় উপকরণ তথা অতি সংক্ষিপ্ত শব্দে যুক্তি প্রমাণ উপস্থাপনের ক্ষেত্রে সেই শ্রেষ্ঠত্ব দেখিয়েছে যে, ধর্মের প্রয়োজনীয় সব দিক তুলে ধরা এবং সমস্ত দলিলপ্রমাণে পূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও আকৃতির দিক থেকে এমন ক্ষুদ্রাকৃতির যে, মানুষ কেবল তিন চার প্রহরে প্রাণভরে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ে ফেলতে পারে। এত সংক্ষিপ্ত যে, মানুষ স্বাচ্ছন্দ্যে তা পড়ে ফেলতে পারে। এখন ভেবে দেখা উচিত যে, কুরআনের প্রাঞ্জলতা কত চমৎকার মু'জিযা যে, জ্ঞানের এক তরঙ্গায়িত সমুদ্রকে তিন চার খণ্ডে সন্নিবিষ্ট করে ফেলেছে এবং প্রজ্ঞার এক বিশাল জগতকে কেবল কয়েক পৃষ্ঠার মাঝে আবদ্ধ করেছে। কেউ কি কখনো দেখেছে বা শুনেছে যে, এমন ক্ষুদ্রাকৃতির একটি কিতাব সকল যুগের সত্য নিজের মাঝে ধারণ করে থাকবে? বিবেক কোন্ মহান ব্যক্তির জন্য এই উচ্চ মর্যাদা প্রস্তাব করতে পারে যে, সে সামান্য কিছু শব্দ দ্বারা প্রজ্ঞার এক সমুদ্র ভরে দেবে যা হতে ধর্মীয় জ্ঞানের কোনো সত্য বাইরে থাকবে না।"

(বারাহীনে আহমদীয়া, রূহানী খাযায়েন, ১ম খণ্ড, পৃ: ৫২৬-৫২৭, টিকা নম্বর-৩)

তিনি এখানে হিন্দুদের গ্রন্থ বেদ এর তুলনা করছিলেন এবং প্রমাণ করেন যে, বেদে তো এমন কিছু বর্ণিতই হয় নি যা কুরআন বর্ণনা করেছে আর বেদের বাদ্যগুলো অতি দীর্ঘ যা পাঠ করাই কষ্টকর। তিনি সকল ধর্মকে চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন যে, আসো! আমি তোমাদেরকে পবিত্র কুরআনের এসব সৌন্দর্য দেখাই।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ছাড়া এ যুগে এমন কেউ নেই যে এভাবে বিশ্ববাসীকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে থাকবে। এরপরও আমাদের প্রতি অপবাদ আরোপ করা হয় যে, আমরা নাকি নাউযুবিল্লাহ কুরআন অবমাননাকারী।

পবিত্র কুরআনের যুগ পরিপূর্ণ শিক্ষার দাবিদার ছিল- এ সম্পর্কে তিনি (আ.) বলেন, পবিত্র কুরআনই কেবল পরিপূর্ণ শিক্ষা প্রদান করেছে এবং একমাত্র পবিত্র কুরআনই এমন যুগে অবতীর্ণ হয়েছিল যাতে পরিপূর্ণ শিক্ষা প্রদান করা আবশ্যক ছিল। এর কিছুটা উল্লেখ পূর্বেও করা হয়েছে। অতএব পবিত্র কুরআ যে কামিল শিক্ষা হওয়ার দাবি করেছে এই দাবিকরার অধিকার কেবলমাত্র এরই ছিল; এ ছাড়া অন্য কোনো ঐশী গ্রন্থ এমন দাবি করে নি। " (বারাহীনে আহমদীয়া ৫ম ভাগ, রূহানী খাযায়েন, ২১খণ্ড, পৃ: ৪)

তিনি (আ.) বলেন, আমাদের মতে মু'মিন সে যে প্রকৃত অর্থে পবিত্র কুরআনের অনুসরণ করে এবং পবিত্র কুরআনকে খাতামুল কুতুব বলে বিশ্বাস করে- মু'মিনের চিহ্ন এটি। আর মহানবী (সা.)-এর আনীত শরীয়তকে চিরস্থায়ী মান্য করে এবং এতে এক অণু পরিমাণ কিংবা বিন্দুমাত্রও পরিবর্তন করে না এবং এর অনুসরণে বিলীন হয়ে নিজেকে নিঃশ্বেষ করে ফেলে এবং নিজ সত্তার প্রতিটি বিন্দু এ পথে উৎসর্গ করে এবং ব্যবহারিক ও জ্ঞানগতভাবে এই শরীয়তের বিরোধিতা করে না, কেবল তখনই সে প্রকৃত মুসলমান হবে।"

(মালফুযাত, ১০ম খণ্ড, পৃ: ২৬৭)

এখন আমাদের আত্মবিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

পবিত্র কুরআন সর্বশেষ ঐশী গ্রন্থ, এ বিষয়ে তিনি (আ.) বলেন, পবিত্র কুরআন এমন এক যুগে অবতীর্ণ হয়েছিল যে যুগে সবধরনের প্রয়োজন বা চাহিদা যা সম্মুখে আসা সম্ভব ছিল সেগুলো সম্মুখে এসে গিয়েছিল অর্থাৎ সমস্ত চারিত্রিক, বিশ্বাসগত আর কথা ও কর্মসংশ্লিষ্ট বিষয় বিকৃত হয়ে গিয়েছিল আর বাড়াবাড়ি ও শৈথিল্য এবং সকল প্রকার নৈরাজ্য চূড়ান্ত সীমায় গিয়ে উপনীত হয়েছিল। তাই পবিত্র কুরআনের শিক্ষাও অবতীর্ণ হয়েছে চূড়ান্ত পর্যায়ের। অতএব এই অর্থে কুরআনী শরীয়ত খতমকারী ও পরিপূর্ণ আখ্যা পেলো। আর পূর্ববর্তী ঐশী কিতাবসমূহ অপরিপূর্ণ ছিল কেননা পূর্ববর্তী যুগে ঐসব নৈরাজ্য যেগুলোর সংশোধনের জন্য ঐশী কিতাবসমূহ এসেছিল সেগুলোও চরম সীমায় উপনীত হয় নি কিন্ত পবিত্র কুরআনের যুগে ঐসব বিষয় চরম সীমায় গিয়ে উপনীত হয়েছিল। অল্প বয়স্ক অথবা যৌবনে পদার্পণকারী অনেকে যারা প্রশ্ন করে থাকেন তাদের জন্য এই উত্তর। প্রথমে ঐসববিষয় চরম সীমায় ছিল না। এখানে (বিকৃতি) চরম সীমায় উপনীত হয়েছে বিধায় শিক্ষাও চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়েছে আর তাই পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে, এজন্য মহানবী (সা.)-এর মাধ্যমে ইসলামের ভিত্তি রচিত হয়েছে। অতএব এখন পবিত্র কুরআন এবং অন্যান্য ঐশী গ্রন্থে র মাঝে পার্থ ক্য হলো, পূর্ববর্তী গ্রন্থ াবলী সব ধরনের বিকৃতি থেকে সুরক্ষিত থাকলেও তা শিক্ষার ত্রুটির কারণে কোনো এক সময়ে পরিপূর্ণ শিক্ষা অর্থাৎ পবিত্র কুরআন প্রকাশিত বা নাযিল হওয়া আবশ্যক ছিল। তাদের সম্মুখে কতিপয় বিষয় আসেই নি তাহলে তারা সেগুলো কীভাবে বর্ণনা করতো? সেগুলোর শিক্ষার ঘাটতি ছিল তাই পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হওয়া আবশ্যক ছিল। তিনি (আ.) আরো বলেন, পবিত্র কুরআনের পর আর কোনো ঐশী গ্রন্থ আসা আবশ্যক নয় কেননা, চূড়ান্তের পর আর কোনো স্তর বাকি থাকে না। তবে হ্যাঁ, যদি ধরে নেওয়া হয় যে, পরবর্তীতে কোনো এক যুগে পবিত্র কুরআনের নীতিগত বিষয়গুলো বেদ এবং ইঞ্জিলের শিরকীয় নীতিতে বদলে দেয়া হবে এবং তৌহীদের শিক্ষার মাঝে পরিবর্তন করা হবে, পবিত্র কুরআনের শিক্ষায় পরিবর্তন-পরিবর্ধন হবে বা যদি ধরে নেওয়া হয় যে, কোনো যুগে কোটি কোটি মুসলমান যারা তৌহীদ আ একত্ববাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত তারাও শিরকের পথ এবং সৃষ্টিপূ জা করতে আরম্ভ করবে তখন নিঃসন্দেহে এমতাবস্থায় ভিন্ন শরীয়ত এবং ভিন্ন রসূল আগমণ করা আবশ্যক হবে। এমন পরিস্থিতি যদি সৃষ্টি হয় তাহলে হতে পারে হবে।

(বারাহীনে আহমদীয়া, রূহানী খাযায়েন, ১ম খণ্ড, পৃ: ১০১-১০২, টিকা নম্বর-৯)

কিন্ত এমনটি হওয়া অসম্ভব, এমনটি হতেই পারে না কেননা আল্লাহ্ তা'লা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, আমি এই শরীয়তকে সুরক্ষিত রাখব এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে এ উদ্দেশ্যেই প্রেরণ করেছেন, আর এটিই আমাদের দায়িত্ব।

এরপর তিনি (আ.) বলেন, পরিত্রাণের জন্য যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা বার বার বলেছেন- সেটিই আবশ্যক আর তা হলো, প্রথমত স্বচ্ছ হৃদয়ে আল্লাহ্ তা'লাকে এক-অদ্বিতীয় মান্য করা এবং মহানবী (সা.)- কে সত্য নবী বলে বিশ্বাস করা আর পবিত্র কুরআনকে আল্লাহ্র কিতাব মান্য করা অর্থাৎ এই বিশ্বাস রাখা যে, কিয়ামত পর্যন্ত আর কোনো ঐশী কিতাব বা শরীয়ত আসবে না অর্থাৎ পবিত্র কুরআনের পর এখন আর কোনো ঐশী গ্রন্থ বা শরীয়তের প্রয়োজন নেই।"

(মালফুযাত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ২৩৬)

কুরআনী ওহীর মহিমা- এ বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, তাদের ওপর খোদা তা'লার অভিসম্পাত যারা দাবি করে যে, তারা কুরআনের অনুরূপ কোনো কিতাব আনতে পারে। পবিত্র কুরআন হলো, মু'জিযা বা নিদর্শন যার মতো গ্রন্থ কোনো মানুষ বা জিন্ন দেখাতে পারবে না। এর মাঝে সেসব তত্ত্বজ্ঞান ও বৈশিষ্ট্য বা গুণাবলী একীভূত হয়েছেযেগুলো মানবীয় জ্ঞান একত্রিত করতে পারে না বরং এগুলো এমন ওহী যার সদৃশ অন্য কোনো ওহীও নেই, রহমান খোদার পক্ষ থেকে পরবর্তীতে কোনো ওহী আগমন করলেও। কেননা ওহী প্রেরণের মাঝে খোদা তা'লার বিভিন্ন জ্যোতির্বিকাশ হয়ে থাকে আর একথা নিশ্চিত যে, খোদা তা'লার জ্যোতির্বিকাশ যেভাবে খাতামুল আম্বিয়া (সা.)-এর প্রতি হয়েছে, এমনটি পূর্বেও কারো প্রতি হয় নি, আর আগামীতেও হবে না। পবিত্র কুরআনের ওহীর যে মর্যাদা রয়েছে ওলী-আউলিয়াদের

যুগ ইমামের বাণী

ইসলামের সুরক্ষা এবং সত্যের উদ্ঘাটনের জন্য সর্বপ্রথম তোমরা প্রকৃত মুসলমানের নমুনা হয়ে দেখাও।

(মালফুযাত , ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬১৫)

দোয়াপ্রার্থী: Saeen Mir and Family, Kogram, Nalhati (Birbhum)

ওহীর সেই মর্যাদা নেই। (ওলী-আউলিয়াদের প্রতিও ওহী হতে পারে কিন্তু সেই মর্যাদার ওহী হয় না) কুরআনের বাক্যাবলীর ন্যায় কোনো বাক্য তাদের প্রতি ওহী করা হলেও। এর কারণ হলো, কুরআনের তত্ত্বজ্ঞানের গণ্ডি বাকি সকল গণ্ডি থেকেবৃহৎ কেননা এর মাঝে সকল প্রকার জ্ঞান, সকল প্রকার বিস্ময়কর এবং গোপন বিষয়াদির সমাহার ঘটেছে। সেগুলোর সূক্ষ্ম দিকগুলো অনেক মহান এবং গভীরতায় উপনীত। তা বর্ণনা এবং প্রমাণ বা যুক্তির ক্ষেত্রে সবচেয়ে অগ্রগামী, তাতে সবচেয়ে বেশি তত্ত্ব জ্ঞান রয়েছে। আর তা খোদার নিদর্শনমূলক বাণী যা কোনো কান শোনে নি আর এ পর্যায়ে কোনো জিন্ন এবং মানুষের বাণী বা কথা পৌঁছতে পারে না। অতএব কুরআন এবং অন্যান্য বাণীর তুলনা সেই স্বপ্নের সাথে করা যায় যা একজন ন্যায়পরায়, সাহসী ও বিজ্ঞ বাদশাহ্ দেখেছিলেন। উদাহরণ দিচ্ছেন, এক বাদশাহ্ একটি স্বপ্ন দেখেন যিনি অত্যন্ত ন্যায়পরায়ন এবং সাহসী ছিলেন অপরপক্ষে একজন সাধারণ মানুষ, দুর্বল প্র কৃতির মানুষ এবং ভীরু এক ব্যক্তিও একই স্বপ্ন দেখে যার পদমর্যাদা বাদশাহ্র মতো ছিল না, সাধারণ মানুষ ছিল, তার বিবেক-বুদ্ধিও কম ছিল, ভীরু ছিল। বাহ্যত যদিও বাদশাহ্ ও সাধারণ ব্যক্তির দেখা স্বপ্ন একই অর্থাৎ এক রকম স্বপ্ন কিন্তু বিবেকবান ও বুদ্ধিমান মাত্রই জানে উভয় স্বপ্ন এক নয়। বুদ্ধিমান মানুষ যারা স্বপ্নের তা'বীর বা ব্যাখ্যা জানেন তারা বলবে, এটি এক রকম স্বপ্নই নয় কেননা ন্যায়পরায়ন বাদশাহ্র স্বপ্নের তা'বীর হবে অনেক উন্নত মানের আর সার্বজনীন এবং কল্যাণকর ও সকল লোকদের জন্য মঙ্গল ও কল্যাণ (জনক) আর অত্যন্ত সঠিক ও পরিস্কার। তার স্বপ্নের পরিধি সুবিস্তৃত। কিন্তু সাধারণের স্বপ্ন অধিকাংশ ক্ষেত্রে সংশয়পূর্ণ, ময়লা-আবর্জনা থেকে মুক্ত হয় না। এছাড়া এর প্রভাব পিতা-পুত্র বা নিকটবর্তী কিছু বন্ধুর উর্ধ্বে যায় না। সীমাবদ্ধ গণ্ডি যেমন পুত্র, পিতা অথবা আত্মীয়স্বজন বা বন্ধু -বান্ধব। তাদের পর্যন্ত এটি কল্যাণকর সাব্যস্ত হতে পারে যদি তা কল্যাণকর স্বপ্ন হয়ে থাকে। তিনি (আ.) বলেন, আর অন্যদেরকেও যদি তার স্বপ্নের গণ্ডিভুক্ত করো যে, হ্যাঁ সাধারণ ব্যক্তির স্বপ্নের গণ্ডিতে অন্যরাও আসতে পারে তবুও এর গণ্ডি সীমাবদ্ধ হবে। যতটা সে জানে সেই গণ্ডির ভিতরেই তার স্বপ্নের কার্যকারিতা থাকবে বা আর তা পালান থেকে নেমে ঘরের ভেতরে ঢুকে যাবে। {মসীহ্ মওউদ (আ.) এখানে একটি প্রবাদ ব্যবহার করেছেন অর্থাৎ তাদের স্বপ্ন খুবই সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে। এর বিস্তৃতি অতটা ব্যাপক হতে পারে না।} কিন্তু পবিত্র কুরআনের বাহনে আরোহণকারীর অবস্থা হলো, তারা জনপদের প্রতিটি গণ্ডিকে অতিক্রম করে। পবিত্র কুরআন এমন একটি ঐশী গ্রন্থ যার পাদদেশ দিয়ে তত্ত্বজ্ঞানের নদ-নদী প্রবাহিত হয় আর কোনো পাখির গান যত সুমিষ্টইহোক না কেন, তা কুরআনের ওপর উড়তে পারে না। এর চেয়ে বেশি উন্নতমানের কথা কেউ বলতে পারে না আর কোনো ব্যক্তির পুঁজি যত বেশি বা কমই হোক না কেন, সে এর ধনভাণ্ডার থেকে আহরণ করে। আমার বিশ্বাস, যে বক্তা এর ধনভাণ্ডার থেকে কিছুটা হলেও নেয় না সে রিক্তহস্ত থেকে যাবে। (এখান থেকে কল্যাণমণ্ডিত না হলে কারো বাণী সঠিক হতেই পারে না।) আর ঋণীর কাছ থেকে কঠোরভাবে (ঋণ ফেরত) চাওয়া হয় আর অনেক চেষ্টা করা হয়ে থাকে যেন, কাযী বা বিচারকের কাছে (বিষয়টি) নিয়ে গিয়ে তার নিকট থেকে ঋণের টাকা আদায় করা যায়। কিন্তু পবিত্র কুরআন দরিদ্রদের সদকা দিয়ে থাকে এবং সকল দারিদ্রতা দূর করে বরং নিষ্ঠাবান লোকদের স্বর্ণের ডালি দিয়ে থাকে।

অন্যরা কাউকে কিছু দিলে ঋণগ্রহীতাদের বিরুদ্ধে মামলা-মোকদ্দমা করে কিন্তু পবিত্র কুরআন এমন জ্ঞান দান করে, যেএর জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ঝর্ণা ক্রমাগতভাবে প্রবাহিত হতে থাকে। এমন যেন স্বর্ণের ডালি তাদেরকে দেওয়া হচ্ছে। ঋণদাতাদের ন্যায় ঋণগ্রহীতাদের অবকাশ দেয়ার খোঁটা দেয় না বরং স্বর্ণ একত্রিত করার ব্যাপারে তাদেরকে অনুপ্রাণিত করে। তিনি (আ.) বলেছেন, প্রথমে আমরা পানপাত্র হয়েছি এরপর কুরআনের নদ-নদী দ্বারা কানায় কানায় পূর্ণ হয়েছি।"

(আল হুদা, রূহানী খাযায়েন, খন্ড-১৮, পৃ: ২৭৫-২৭৮)

আমার অবস্থা জিজ্ঞেস করছো! আমি তো প্রথমে একটি পেয়ালা হয়েছি, পানপাত্র হয়েছি আর এরপর পবিত্র কুরআনরূপী যে নদ-নদী রয়েছে তার পানি দিয়ে আমি নিজেকে পরিপূর্ণ করেছি। এটি আরবী একটি বাক্যের অনুবাদ। আরবী প্রবন্ধে এমনটি হয় কেননা এর নিজস্ব একটি ধরণ রয়েছে। অনুবাদও এভাবেই করা হয়েছে।

তিনি (আ.) বলেন, আমার মতে খোদার অভিসম্পাত সেই ব্যক্তির ওপর যে পবিত্র কুরআনের নিদর্শন হওয়ার কথা অস্বীকার করে আর নিজের বাণী এবং বক্তৃতাকে স্থায়ী কোনো জিনিস মনে করে। খোদার শপথ! আমি এই প্রস্রবণ থেকে পান করি এবং এর সৌন্দর্য দ্বারা সুসজ্জিত হই। এ কারণেই আমার বাণীতে জ্যোতি এবং স্বচ্ছতা দেখা যায় এবং আমাদের বাণীতে আলো এবং স্বচ্ছতা আর সতেজতা ও সৌন্দর্য উদ্ভাসিত হয়। পবিত্র কুরআন ছাড়া আমার প্রতি আর কারো অনুগ্রহ নেই আর এটি আমাকে এমনভাবে লালনপালন করেছে যে, পিতামাতাও এমনভাবে লালনপালন করেন না এবং এথেকে খোদা আমাকে সুমিষ্ট পানি পান করিয়েছেন আর আমরা একে দীপ্তিমান ও সাহায্যকারী হিসেবে পেয়েছি।" (আল হুদা, রূহানী খাযায়েন, খন্ড-১৮, পৃ: ২৭৯)

তিনি (আ.) আরো বলেন, আমার সাথে যদি আল্লাহ্ তা'লার কোনো নিদর্শন না থাকত এবং তাঁর সাহায্য ও সমর্থন যদি আমার সহায় না হতো আর আমি যদি কুরআন ভিন্ন অন্য কোনো পথ অবলম্বন করতাম অথবা কুরআনের বিধিনিষেধ ও শরীয়তে কোনো প্র কারহস্তক্ষেপ করতাম বা রহিত করে থাকতাম কিংবা মহানবী (সা.)-এর অনুসরণ ব্যতীত অন্য কোনো পথের সন্ধান দিতাম তাহলে অবশ্যই (তাদের) অধিকার ছিল এবং মানুষের এ আপত্তি করা যুক্তিসঙ্গত ও গ্রহণযোগ্য হতো যে, আসলেই এই ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের শত্রু এবং পবিত্র কুরআন ও এর শিক্ষার অস্বীকারকারী এবং তা রহিতকারী। আমি যদি কুরআন ও মহানবী (সা.)-এর বাণীর বাইরে কিছু বলতাম তাহলে নিশ্চয়ই তোমাদের একথা বলার অধিকার ছিল যে, (আমি কুরআন) রহিতকারী ও পাপী। অর্থাৎ তাহলে নিঃসন্দেহে তোমরা আমাকে বলতে পারতে যে, আমি একজন পাপী, অসৎ, মুরতাদ। কিন্তু আমি যখন কুরআনে কোনো পরিবর্তন করি নি এবং মহানবী (সা.)-এর আনীত পূর্ববর্তী শরীয়তের এক বিন্দুবিসর্গও পরিবর্তন করি নি, বরং আমি তো কুরআন ও এর বিধিনিষেধের সেবা এবং মহানবী (সা.)-এর পবিত্র ধর্মের সেবায় সর্বদা সচেষ্ট আর আমার প্রাণও এই পথে নিবেদিতকরে রেখেছি। এছাড়া আমার পরিপূর্ণ বিশ্বাস হলো পূর্ণাঙ্গীন ও সম্পূর্ণ গ্রন্থ পবিত্র কুরআনের অনুকরণ এবং মহানবী (সা.)-এর অনুসরণ ব্যতীত নাজাত বা মুক্তি লাভ করা একেবারেই অসম্ভব আর যারা পবিত্র কুরআনের (শিক্ষায়) কমবেশি করে এবং মহানবী (সা.)-এর আনুগত্যের জোয়াল নিজেদের ঘাড় থেকে নামিয়ে রাখে তাদেরকে আমি কাফির ও মুরতাদ জ্ঞান করি। {যারা মহানবী (সা.)-এর আনুগত্য ও অনুসরণের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে যায় এবং এর জোয়াল নিজেদের ঘাড় থেকে নামিয়ে রাখে তারা তো মুরতাদ ও কাফির।} তাহলে এমতাবস্থায় আমার সত্যতার এমন হাজার হাজার নিদর্শন প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও। {আমি শুধু দাবি করেছি এমনটিই নয় বরং আল্লাহ্ তা'লা বিভিন্ন নিদর্শনও প্রদর্শন করেছেন, প্রতিশ্রুত মসীহ্ সম্পর্কে মহানবী (সা.)-এর বিভিন্ন ভবিষ্যদ্বাণীও পূর্ণ হয়েছে, পবিত্র কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণীও পূর্ণ হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে যা বলেছেন, তাঁর প্রতি যেসব ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন তা পূর্ণ হয়েছে এবং হচ্ছে।} যেগুলো আল্লাহ্ তা'লা আজ পর্যন্ত আমার সমর্থনে আকাশ ও পৃথিবীতে প্রকাশ করেছেন, এরপর যে ব্যক্তি আমাকে মিথ্যাবাদী, প্রতারক ও দাজ্জাল নামে সম্বোধন করে বা যে আমার প্রতি ভ্রুক্ষেপকরে না এবং আমার আহ্বানে সাড়া দেয় না (তার ব্যাপারে) নিশ্চিত জেনে রেখো যে, আল্লাহ্ তাকে ধৃত না করে ছাড়বেন না।" (মালফুযাত, ১০ম খণ্ড, পৃ: ৩০৮-৩০৯)

কখনো না কখানো সে অবশ্যই ধৃত হবে। অতএব এটিই হলো হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দাবি। এছাড়া তাঁর মাধ্যমেই কুরআনের (প্রকৃত শিক্ষা) আমাদের কাছে পৌঁছেছে এবং তিনি (আ.) পবিত্র কুরআনে পরিপূর্ণ অনুসরণ করেছেন আর আমাদেরকে পবিত্র কুরআনের প্রকৃত জ্ঞান দান করেছেন– এ বিষয়টি আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

যেসব মানুষ তাঁর বিরুদ্ধে বা তাঁর জামা'তের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ করে থাকে যে, নাঊযুবিল্লাহ্ আমরা পবিত্র কুরআন অবমাননা করি, তাদের চিন্তা করা উচিত। এগুলো আল্লাহ্র প্রত্যাদিষ্টের কথা।

যেসব লোক হঠকারিতা বা একগুঁয়েমি পরিত্যাগ করে না বা করছে না খোদা তাদেরকে ধৃত না করে ছাড়বেন না। তিনি কীভাবে ধরবেন বা কীভাবে ধৃত করবেন তা আল্লাহ্ই ভালো জানেন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) পবিত্র কুরআনের বিধিনিষেধ সম্পর্কে বিভিন্ন স্থানে অনেক কথা বলেছেন। তার মধ্য হতে আমি কয়েকটি বিষয় এখানে বর্ণনা করছি।

পবিত্র কুরআনে ন্যায় প্রতিষ্ঠার উচ্চাঙ্গের শিক্ষা সম্পর্কে [তিনি (আ.)] বলেন, মক্কার কাফিরদের মতো যেসব জাতি অন্যায়ভাবে অত্যাচার করে, কষ্ট দেয়, রক্তপাত ঘটায়, পিছু ধাওয়া করে এবং শিশু ও নারীদের হত্যা করে এবং যুদ্ধ করা থেকেও বিরত হয় না, এ ধরনের মানুষের সাথে ন্যায়নিষ্ঠাপূর্ণ আচরণ করা খুবই কঠিন কাজ। মানুষ এতো অত্যাচার করা পরও তাদের সাথে ন্যায়বিচারের শিক্ষা দেওয়া অনেক কঠিন কাজ। কিন্তু কুরআনের শিক্ষা এমন প্রাণের শত্রুদের অধিকারও নষ্ট করে নি, বরং ন্যায়বিচার ও সদাচরণের উপদেশ দিয়েছে।"

(নুরুল কুরআন নম্বর-২, রূহানী খাযায়েন, ৯ম খণ্ড, পৃ: ৪০৯)

অতএব এগুলো হলো সেসব নীতি যা সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার নিশ্চয়তা প্রদান করে। বিশ্বে র শান্তি প্রতিষ্ঠার জামানত। বর্তমানে জাগতিক যুদ্ধে লিপ্ত এসব জাতি যদি এই নীতিটি অনু ধাবন করতে সক্ষম হয় তবেই পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নতুবা যে অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে তা ভয়ঙ্কর যুদ্ধের দিকে নিয়ে যাচ্ছে– তা একটি দেশের চেষ্টায় হোক কিংবা অন্যান্য দেশের চেষ্টায়; নেতৃত্ব এক দেশে যাক কিংবা অন্য দেশে; চীনে যাক বা অন্য কোথাও যাক। ন্যায় প্রতিষ্ঠা না করলে ধ্বংস অনিবার্য।

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

" তুচ্ছ এ জীবন যাকে নিয়ে এত গর্ব করা হয়। চিরন্তন আনন্দের জীবন সেটিই যা মৃত্যুর পর লাভ হয়।"

(মমালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬১৬)

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)

আরেকটি দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে তিনি (আ.) একস্থানে বলেন, কেউ যদি কুরআনের যুগের প্রতি একটু দৃষ্টি নিবদ্ধ করে দেখে যে, পৃথিবীতে বহুবিবাহের বিষয়টি কোন পর্যায়ে পৌছে গিয়েছিল। (লাগামহীনভাবে) বিয়েশাদী করতো, কতগুলো স্ত্রী থাকতো। মানুষ শত শত কিংবা ৮০টির মতো করে স্ত্রী রাখতো। আর কতইনা ভারসাম্যহীন আচরণ মহিলাদের প্রতি করা হতো! মহিলাদের ওপর কতই না অত্যাচার হতো। অতএব এটি স্বীকার করতেই হবে যে, কুরআন পৃথিবীর প্রতি এই অনুগ্রহ করেছে যে, এসব ভারসাম্যহীনতা দূর করেছে।" (আরিয়া ধর্ম, রূহানী খাযায়েন, ১০ম খণ্ড, পৃ: ৪৫)

এটি আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ, পবিত্র কুরআনের শিক্ষামালার অনুগ্রহ যে, পবিত্র কুরআনের শিক্ষারমাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা এসব কুপ্রথা বিলুপ্ত করেছেন। মহিলাদের কোনো সম্মান ছিল না। বিয়ের কোনো সীমা-পরিসীমা ছিল না। (মহিলাদের) কোনো অধিকার ছিল না। এসব কিছু পবিত্র কুরআন প্রদান করেছে এবং ইসলামের পূর্বে এটি কল্পনাও করা যেত না।

পুনরায় একস্থানে তিনি (আ.) বলেন, পবিত্র কুরআন কেবল শ্রুত বিষয় পর্যন্তই সীমিত নয়, কেননা এতে মানুষকে বুঝানোর জন্য বড়ো বড়ো যৌক্তিক প্রমাণাদি রয়েছে এবং যত বিশ্বাস, নীতি এবং বিধিবিধান এটি উপস্থাপন করেছে সেগুলোর মাঝে এমন কোনো বিষয় নেই যাতে জবরদস্তি ও বলপ্রয়োগ আছে। যে-সব বিধিবিধান রয়েছে সেগুলোর মাঝে কোনো বলপ্রয়োগ নেই, কোনো জোরজবরদস্তি নেই। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লা বলেন, لَاۤ اِکۡرَاہَ فِی الدِّیۡنِ অর্থাৎ ধর্মে কোনো বিষয় জোর করে মানায় না। অর্থাৎ ধর্ম কোনো কিছু জোর করে মানাতে চায় না বরং প্রতিটি বিষয়ে যুক্তিপ্রমাণ উপস্থাপন করে।"

(ইসলামী ওসুল কি ফিলাসফী, রূহানী খাযায়েন, ১০ম খণ্ড, পৃ: ৪৩৩)

যুক্তিপ্রমাণ উপস্থাপনের মাধ্যমে মানার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

আবার পবিত্র কুরআনের পরিপূর্ণ শিক্ষার ঘোষণা প্রদানের মাধ্যমে বিশ্ববাসীকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে তিনি (আ.) বলেন,আমাদের খোদা তা'লা যিনি হৃদয়সমূহের গোপন রহস্য সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত। (তিনি) একথার সাক্ষী, কোনো ব্যক্তি যদি পবিত্র কুরআনের শিক্ষামালার মাঝে এক বিন্দুর এক হাজার ভাগের এক ভাগ পরিমাণ ত্রুটিও বের করতে পারে কিংবা এর বিপরীতে নিজের কোনো গ্রন্থের এক বিন্দু পরিমাণ এমন গুণ প্রমাণ করতে পারে যা কুরআনের শিক্ষার বিপরীত এবং এর চেয়ে উত্তম তবে আমরা মৃত্যুর শাস্তিও মাথা পেতে নিতেও প্রস্তুত।"

(বারাহীনে আহমদীয়া ৩য় ভাগ, রূহানী খাযায়েন, ১ম খণ্ড, পৃ: ২৯৮)

অতএব এটি এমন বড় দাবি যা পরিপূর্ণ ঈমান এবং দৃঢ়বিশ্বাস ছাড়া করাই সম্ভব না। তিনি (আ.) বলেন, কোনো ব্যক্তি যদি খোদা তা'লার প্রতি ঈমান রাখে এবং পবিত্র কুরআনেখোদা তা'লা কী বর্ণনা করেছেন তার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করে তাহলে সে ব্যক্তি উন্মাদের ন্যায় জগৎ-সংসার পরিত্যাগ করে খোদার হয়ে যাবে।"

(ঈমান যদি পরিপূর্ণ হয় আর পবিত্র কুরআনের প্রতি পূর্ণ মনোযোগ নিবদ্ধ করে তবে জগতের পরিবর্তে খোদা তা'লার প্রতি সর্বদা তার দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকবে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে এই জ্ঞান দান করুন।

তিনি (আ.) বলেন, "বর্ত মানে ভূপৃষ্ঠে সকল ঐশী গ্রন্থের মাঝে একমাত্র পবিত্র কুরআনই রয়েছে যার ঐশীবাণী হবার বিষয়টি অকাট্য যুক্তিপ্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত।

যার পরিত্রাণের নীতি ষোলোআনা সততা ও মানবপ্রকৃতি সম্মত। অর্থাৎ নাজাত বা পরিত্রাণের যে নীতি রয়েছে তা মানব প্রকৃতিসম্মত। যার বিভিন্ন আকিদা বা বিশ্বাস এমন পরিপূর্ণ ও দৃঢ় যার শক্তিশালী দলিলপ্রমাণ এর সত্যতার অকাট্য সাক্ষী, যার বিধিবিধান কেবলই সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত, যার শিক্ষামালা সকল প্রকার শিরকের কালিমা, বিদআত এবং সৃষ্টিপূজা থেকে সম্পূর্ণ রূপে পবিত্র। যাতে একত্ববাদ, আল্লাহ্ তা'লার সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশের জন্য চরম পর্যায়ের উদ্দীপনা রয়েছে এবং যার বৈশিষ্ট্য হলো, স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকেই এটি সুস্পষ্ট একত্ববাদে পরিপূর্ণ আর কোনো প্রকার কালিমা, ক্ষতি, ত্রুটিবিচ্যুতি, অকর্মন্য বৈশিষ্ট্য আল্লাহ্ তা'লার প্রতি আরোপ করে না এবং কোনো বিশ্বাসকে জোরপূর্বক মানাতে চায় না। এটি জোরপূর্ব ক কোনো বিশ্বাস চাপিয়ে দিতে চায় না বরং দলিল উপস্থাপন করে। তিনি (আ.) বলেন, যে শিক্ষা দেয় প্রথমে তার সত্যতার বিভিন্ন হেতু দেখিয়ে দেয় এবং প্রত্যেক চাহিদা ও দাবিকে অকাট্য দলিলপ্রমাণ দ্বারা প্রমাণ করে আর প্রতিটি নীতির প্রকৃত তত্ত্ব সম্পর্কে সুস্পষ্ট দলিলপ্রমাণ উপস্থাপনের মাধ্যমে পরিপূর্ণ বিশ্বাস ও তত্ত্বজ্ঞানের পরম মার্গ পর্যন্ত পৌছে দেয়। এছাড়া যেসব ত্রুটিবিচ্যুতি, অপবিত্রতা, অনিষ্ট ও নৈরাজ্য মানুষের বিশ্বাস, আমল, কথা ও কর্মে নিহিত রয়েছে সেসব বিশৃঙ্খলাকে সুস্পষ্ট দলিলপ্রমাণের আলোকে দূর করে এবং এমন সব শিষ্টাচার শিক্ষা দেয় যা মানুষকে মানুষে পরিণত হওয়ার জন্য একান্ত আবশ্যক। মানুষ হওয়ার জন্যও আদব বা শিষ্ঠাচারের প্রয়োজন রয়েছে আর সেসব আদব বা শিষ্টাচারের শিক্ষা পবিত্র কুরআনে পাওয়া যায়। এছাড়া প্রত্যেক মন্দকে এটি সেভাবেই প্রতিহত করে যেভাবে তা বর্তমানে ছড়িয়ে পড়েছে। এমন নয় যে, কোনো এক যুগের মন্দকে প্রতিহত করেছে, বরং প্র ত্যেক মন্দকে এটি সেভাবেই প্রতিহত করে যেভাবে তা প্রচলিত রয়েছে। অর্থাৎ যে গতিতে বর্তমানে প্রচলিত আছে সেই গতিতেই এর প্রতিরোধও সেখান থেকে উদ্ভূত হয়, এর চিকিৎসা বেরিয়ে আসে ও একে প্রতিহত করে। আর এর শিক্ষা অত্যন্ত সুদৃঢ়, শক্তিশালী, বলিষ্ঠ ও পূর্ণাঙ্গ মনে হয় যেন প্রকৃতির বিধানের একটি দর্পণস্বরূপ এবং প্রাকৃতিক নিয়মের এক প্রতিবিম্বস্বরূপ আর হৃদয় ও অন্তরের দৃষ্টিশক্তির জন্য প্রদীপ্ত সূর্যের ন্যায়। অর্থাৎ প্রদীপ্ত সূর্য। আর জ্ঞানের সংকীর্ণতাকে বিস্তৃতিদাতা এবং এর ক্ষতিপূরণকারী।"

(বারাহীনে আহমদীয়া ২য় ভাগ, রূহানী খাযায়েন, ১ম খণ্ড, পৃ: ৮১-৮২)

যেসব জ্ঞানের কথা সংক্ষিপ্ত হয়ে থাকে সেগুলোকে সবিস্তারে বর্ণ না করে এবং ক্ষতি বা ঘাটতি পূরণ করে।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে সত্যিকার অর্থে পবিত্র কুরআনের অনুসরণকারী, এর শিক্ষা মান্যকারী, একে অনুধাবনকারী এবং এর অনুকরণে নিজেদের জীবন পরিচালনাকারী বানান। রমযান মাসের পরেও এই নিয়ামত থেকে এভাবেই কল্যাণ লাভের চেষ্টা করতে থাকুন যেভাবে রমযান মাসে করছেন।

রমযানে জামা'তের বিরুদ্ধবাদীদের অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যও বিশেষভাবে দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক অনিষ্টকারীর হাতকে প্রতিহত করুন এবং তাদেরকে ধৃত করার উপকরণ সৃষ্টি করুন। পৃথিবীকে নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যও সামগ্রিকভাবে অনেক দোয়া করুন।

অনুরূপভাবে ফিলিস্তিনেও বর্তমানে অনেক বড় নৈরাজ্য সৃষ্টি হয়েছে, ফিলিস্তিনের মুসলমানদের জন্যও দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে অত্যাচারীর অত্যাচার ও নির্যাতন থেকে রক্ষা করুন এবং মুসলিম বিশ্বের নেতাদের বিবেকবুদ্ধি দান করুন যেন তারা ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে মুসলমানদের সামগ্রিক স্বার্থের সুরক্ষাকারী হয়।

আল্লাহ্ তা'লা এই রমযানে আমাদের জন্যকল্যাণ ও আশিসের দ্বার পূর্বের চেয়ে আরো বেশি উন্মুক্ত করুন, আমীন।

২ পাতার পর.......

● عَنِ الْحٰرِثِ الْاَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ اَمَرَ يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا عَلَيْهِمَا السَّلَامَ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ .... وَاَنَا اٰمُرُكُمْ بِخَمْسٍ اللهُ اَمَرَنِيْ بِهِنَّ ، بِالْجَمَاعَةِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَاِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ قَيْدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْاِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ اِلَّا اَنْ يَّرْجِعَ وَمَا دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ مِنْ جِثَاءِ جَهَنَّمَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَاِنْ صَامَ وَاِنْ صَلّٰى قَالَ وَاِنْ صَامَ وَاِنْ صَلّٰى وَزَعَمَ اَنَّهُ مُسْلِمٌ فَادْعُوا الْمُسْلِمِيْنَ بِاَسْمَائِهِمْ بِمَا سَمَّاهُمُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ الْمُسْلِمِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ عِبَادِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ ـ (مسند احمد جلد ۵ صفحہ ۱۳۰، صفحہ ۲۰۲ صفحہ ۳۴۴، بحوالہ حدیقۃ الصالحین حدیث نمبر 158)

হযরত হারাস আশআরী (রা.) বর্ণনা করেন, আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'লা হযরত এহিয়া বিন যাকারিয়া (আ.) পাঁচটি বিষয়ের আদেশ দিয়েছিলেন।..... আর আমিও তোমাদেরকে সেই পাঁচটি বিষয়ের আদেশ দিচ্ছি যেগুলি আল্লাহ্ তা'লা আমাকে দিয়েছেন। ১) জামাতের সঙ্গে থাক। ২) যুগ ইমামের কথা শোন। ৩) ইমামের আনুগত্য কর। ৪) ধর্মের কারণে স্বদেশ ত্যাগ করতে হলেও কর। ৫) আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ কর। অতএব, যে ব্যক্তি জামাত থেকে একটুও পৃথক হয়েছে পক্ষান্তরে সে ইসলাম থেকেই সম্পূর্ণরূপে পৃথক হয়ে গেছে, সেই ব্যক্তি ছাড়া যে পুনরায় জামাতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আর যে ব্যক্তি অজ্ঞতার বিষয়ের দিকে আহ্বান করে সে জাহান্নারে ইন্ধন। সাহাবাগণ নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্ রসুল! এমন ব্যক্তি যদি নামায পড়ে এবং রোযা রাখে তবুও? আঁ হযরত (সা.) বললেন, হ্যাঁ, সে যদি নামাযও পড়ে, রোযাও রাখে এবং নিজেকে মুসলমান বলেও মনে করে তবুও। কিন্তু হে আল্লাহ্র বান্দারা! তোমরা স্মরণ রেখো! (এমন অবস্থা সত্ত্বেও) যারা নিজেদেরকে মুসলমান হিসেবে দাবি করে, তোমরাও তাদেরকে মুসলমান বলবে। কেননা আল্লাহ্ তা'লা (নির্ধারণের জন্য) এই উম্মতের নাম মুসলমান এবং মোমেন রেখেছেন। (তাই তোমরা তাদেরকে খোদার হাতে ছেড়ে দাও)

অতএব, উপরোক্ত হাদীসগুলি থেকে জানা যায় যে, আমাদের প্রিয় নবী (সা.) ইমাম এবং জামাতের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকার প্রতি কতটা গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এমনকি তিনি নির্দেশ দিয়েছেন, যদি তোমাদের প্রতি অবিচার বা অন্যায় হয়, তবুও তোমরা জামাতের সঙ্গে থেকো, জামাত থেকে পৃথক হয়ো না। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের মুসলমান ভাইয়েদেরকে খিলাফতে আহমদীয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত থেকে নিজেদের পরকাল সুসজ্জিত করার তৌফিক দান করুক। আমীন। সেই সব আহমদীদের জন্যও এই হাদীসগুলি প্রণিধানযোগ্য যারা অসন্তুষ্ট হয়ে জামাত থেকে পৃথক হয়ে যায় এবং নিজেদের পরকালকে ধ্বংস করে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে সর্বাবস্থায় জামাতের ব্যবস্থাপনার সঙ্গে যুক্ত থাকার এবং মনে প্রাণে খিলাফতের আনুগত্য করার তৌফিক দান করুন।

****

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁহযরত (সা.) বলেন- 'আমি আল্লাহ্ তা'লার নিকট 'লাওহে মাহফুয' এ সেই সময় খাতামান্নাবীঈন আখ্যায়িত হয়েছি যখন আদম সৃষ্টির উন্মেষ লগ্নে ছিলেন। (মুসনাদে আহমদ)

দোয়াপ্রার্থী: Shujauddin and Family , Barisha (Kolkata)

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) এর দোয়া গৃহীত হওয়ার ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলী

মূল-আতাউল মুজীব লোন, সদর মজলিস আনসারুল্লাহ্ ভারত ও প্রিন্সিপাল জামিয়া আহমদীয়া

অনুবাদক : মির্জা মহম্মদ এনামুল কবীর (মুয়াল্লিম সিলসিলা আহমদীয়া)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ ۚ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَحُوْلُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهٖ وَاَنَّهٗٓ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ

অর্থ : হে যাহারা ঈমান আনিয়াছো! আল্লাহ এবং রসূলের আহ্বানে উপস্থিত আছি বল যখন তিনি তোমাদেরকে জীবিত করার উদ্দেশ্যে ডাক দেন। আল্লাহ মানুষ ও তার অন্তরের মাঝে বিরাজ করেন। আর একথাও জেনে নাও যে, তোমরা তাঁরই প্রতি একত্রিত হবে। (সূরা আনফাল : ২৫)

মাননীয় সভাপতি মহাশয় ও সম্মানীয় শ্রোতামণ্ডলী!

আমার বক্তব্যের বিষয় হল, **" হজরত আমিরুল মোমেনীন খলিফাতুল মসীহ পঞ্চম (আইঃ) এর দোয়া গৃহিত করণের ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলী ও দোয়ার বিষয়ে হুজুর আনোয়ারের আহ্বান ও উপদেশাবলী।"**

আমি এখনি কোরান মজীদের যে আয়াত পাঠ করলাম সেখানে আল্লাহ তা'লা বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর প্রত্যাদিষ্ট পুরুষদের প্রেরণের উদ্দেশ্য হল আধ্যাত্মিক রূপে মৃত ব্যক্তিদের জীবিত করা। আল্লাহ তা'লার পক্ষ হতে প্রেরিত রসূলগণ যে সমস্ত মাধ্যমে নিজ অনুসারীদের আধ্যাত্মিকভাবে জীবিত করেন তার মধ্যে একটা অন্যতম মাধ্যম হল দোয়া যা রসুলগণ তাঁর মান্যকারীদের জন্য করে থাকেন। আর আল্লাহ তা'লা সেগুলিকে গ্রহণ করে মানুষের আধ্যাত্মিক জীবন লাভের উপকরণ সৃষ্টি করেন। মহানবী (সাঃ) বলেন-

ما كانت النبوة قط الا تبعتها خلافة

অর্থাৎ যখনই পৃথিবীতে কোন নবী আগমণ করেন তারপর তাঁর কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য খিলাফত ব্যবস্থাপনা জারি হয়ে যায়।

হজরত মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী মসীহে মাওউদ ও মাহদী-এ মাহুদ (আঃ) এর মৃত্যুর পর আল্লাহতা'লার অঙ্গীকার ও মাহদী (আঃ)-এর সুসংবাদ অনুসারে খিলাফতের ব্যবস্থাপনা জামাতে আহমদীয়াতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এবং খিলাফতের অনুসারীরা খিলাফতের সেই সমস্ত কল্যাণ হতে কল্যাণ মণ্ডিত হচ্ছে যা আল্লাহতা'লা এর মধ্যে নিহিত রেখেছেন। আর আধ্যাত্মিকভাবে সেই সমস্ত লোক এর দলভূক্ত হয়েছে যারা হজরত মসীহে মাওউদ (আঃ)- এর পর এখন খিলাফতের মাধ্যমে জীবিত হচ্ছে। দোয়া কবুলিয়তের মাধ্যমে যেভাবে হজরত মসীহে মাওউদ (আঃ) নিজ মান্যকারীদের আধ্যাত্মিক রূপে জীবিত করে এসেছিলেন অনুরূপভাবে তাঁর পর তাঁর উত্তরাধিকারে প্রত্যেক যুগ-খলিফাগণও জীবিত করেছেন এবং বর্তমানেও এই ধারা পঞ্চম খলিফার যুগে পূর্ণ মর্যদার সঙ্গে জারি রয়েছে।

আমি আপনাদের সম্মুখে হজরত আমিরুল মোমেনীন পঞ্চম খলিফার দোয়া গৃহিত হওয়ার কিছু ঘটনা বর্ণনা করার পূর্বে দোয়ার উপকারীতা, গুরুত্ব ও কল্যাণ সম্পর্কে হজরত মসীহে মাওউদ (আঃ) এর গুটিকতক উদ্ধৃতি উপস্থাপন করব। কেননা এই যুগে তিনি একমাত্র সত্তা যিনি দোয়া সম্পর্কে প্রত্যেকটি বিষয়কে কেবল ব্যাখ্যা করে বর্ণনা করেননি বরং প্রত্যেক আহমদীর অন্তরে এই বিষয়টিকে এমনভাবে বর্ণনা করেছেন যে, এখন প্রতিটি আহমদীর জীবন কেবল দোয়া এবং এটাই সেই খাদ্য যার মাধ্যমে আধ্যাত্মিক জীবনের উপকরণ প্রস্তুত করে। হজরত মসীহে মাওউদ (আঃ) বলেন,

"দোয়া এক অসাধারণ শক্তি বিশেষ, যার দ্বারা বড় বড় কঠিন বিষয়ের সমাধা হয়ে যায় এবং কঠিন পথকে মানুষ সহজে অতিক্রম করে ফেলে। কেননা দোয়া সেই কল্যাণ ও শক্তিকে আকর্ষণকারী যা আল্লাতা'লার পক্ষ হতে আসে। যে ব্যক্তি অধিক পরিমাণে দোয়ায় মগ্ন থাকে, পরিশেষে সে সেই কল্যাণকে আকর্ষণ করে এবং খোদাতা'লার নিকট হতে সমর্থন প্রাপ্ত হয়ে নিজ উদ্দেশ্যকে লাভ করে। ..... নিশ্চিত জেনো যে, দোয়া এক মহা সম্পদ। যে ব্যক্তি দোয়াকে পরিত্যাগ করেনা তার ধর্ম ও কর্মে বিপদ আসবে না। সে ব্যক্তি এমন এক দূর্গের মধ্যে সুরক্ষিত আছে, যার চারপাশে সর্বদা সশস্ত্র প্রহরী সুরক্ষা প্রদান করে থাকে। কিন্তু যে ব্যক্তি দোয়ার প্রতি মনোযোগ করেনা, সে- সেই ব্যক্তির ন্যায় যে নিরস্ত্র ও অসহায় এবং এমন জঙ্গলে বসবাস করে যা হিংস্র ও বর্বর পশুদের দ্বারা পূর্ণ। সে অনুমান করতে পারে যে, সে মোটেই সুরক্ষিত নয়। এক মুহূর্তে সে বর্বর পশুদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে যাবে এবং তার সঙ্গে কিছুই অবশিষ্ট থাকবেনা। এ জন্য স্মরণ রেখো যে মানুষের বড় সৌভাগ্য এবং তার সুরক্ষার প্রকৃত মাধ্যম হল এই দোয়া।

এই দোয়াই হল তার জন্য আশ্রয় যদি সে সর্বদা তার মধ্যে নিয়োজিত থাকে।" (মালফুজাত সপ্তম খণ্ড, পৃঃ ১৯২-১৯৩, প্রকাশনা লন্ডন ১৯৮৪)

দোয়া কবুলিয়াতের অবস্থা বর্ণনা করে হজরত মসীহে মাওউদ (আঃ) বলেন:-

" দোয়ার প্রকৃতি হল এই যে, একজন নিষ্ঠাবান বান্দা ও তার প্রভূর মধ্যে পরস্পরের এক আকর্ষণ। অর্থাৎ প্রথমে খোদাতা'লার রহমানিয়্যাত বান্দাকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে, অতঃপর বান্দার সততার আকর্ষণের ফলে খোদাতা'লা তার নিকট হয়ে যায় এবং দোয়ার অবস্থায় সেই সম্পর্ক একটি নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে স্বীয় আশ্চর্য গুণ প্রকাশ করে। সুতরাং বান্দা যখন কোন কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হয়ে খোদাতা'লার দিকে পূর্ণ বিশ্বাস, পূর্ণ আশা, পূর্ণ ভালোবাসা, পূর্ণ নিষ্ঠা ও পূর্ণ সাহস সহ তাঁর প্রতি ঝুঁকে এবং অত্যন্ত সজাগ হয়ে অলসতার পর্দা ছিঁড়ে বিলীনতার ময়দানে ক্রমশ অগ্রসর হতে থাকে। অতঃপর আগে গিয়ে দেখতে পায় যে মহান আল্লাহর দরবার এবং তার সঙ্গে কোন অংশীদার নেই। তখন তার আত্মা সেই দরবারে মাথা পেতে দেয়, এবং তার মধ্যে যে আকর্ষণ শক্তি রাখা হয়েছে তা খোদাতা'লার কৃপাকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করে। তখন মহান মর্যাদাবান আল্লাহ সেই কাজ পূর্ণ করার প্রতি মনোযোগ দেন এবং সেই দোয়ার প্রভাব সেই সমস্ত আবাদকৃত বস্তুর উপর ফেলেন যার দ্বারা এমন ব্যবস্থা না সৃষ্টি হয়, যা সেই উদ্দেশ্যকে প্রাপ্ত করার জন্য আবশ্যিক। যেমন বৃষ্টির জন্য যদি দোয়া হয়ে থাকে তাহলে দোয়া গৃহিত হওয়ার বৃষ্টির জন্য যে প্রাকৃতিক অবস্থার প্রয়োজন সেই দোয়ার ফলে সৃষ্টি হয়ে যায়। আর যদি অনাবৃষ্টির জন্য বদদোয়া হয়ে থাকে তাহলে সর্ব শক্তিমান তার বিপরীত অবস্থা সৃষ্টি করে দেন। এ কারণেই এ কথা বড় বড় দিব্যদর্শী ও উচ্চমানের খোদাওয়ালাদের নিকট বহু পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, পরিপূর্ণ মানবদের দোয়াতে সৃষ্টি করার এক প্রকার শক্তি থাকে অর্থাৎ আল্লাহতা'লার নির্দেশে সেই দোয়া নীচের জগতে ও উপরের জগতে কাজ করা আরম্ভ করে দেয় এবং সমস্ত ভৌতিক তত্ত্ব ও চাঁদ-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র এবং মানবের হৃদয়কে সেই দিকে নিয়ে যাওয়া হয় যেদিকে তার সমর্থনের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে।"

(বারাকাতুদ-দোয়া, রুহানী খাজায়েন ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৯-১০)

শ্রোতামণ্ডলী! এখন আমি হজরত আমিরুল মোমেনীন পঞ্চম খলিফা (আইঃ) এর অসংখ্য দোয়া গৃহিত হওয়ার ঘটনার মধ্যে থেকে সময় সাপেক্ষে কয়েটি উপস্থাপন করছি।

(১) খিলাফতে আহমদীয়া এমন এক কল্যাণ যা তৃষ্ণার্ত হৃদয়কে যেখানে পিপাসা নিবারণ করে, সেখানে অযোগ্য বনভূমিকেও পানি সিঞ্চন করে। জলসা সালানা ২০১২ এর দ্বিতীয় দিন বক্তৃতার মধ্যে হুজুর (আইঃ) আফ্রিকা মহাদেশে প্রকাশিত শত শত নিদর্শনের মধ্যে থেকে একটা নিদর্শনের কথা এভাবে উল্লেখ করেন যে,

"মালির আমির সাহেব লেখেন, গত বছর খুব কম বৃষ্টি হয়েছিল যে কারণে খুব কষ্টকর অবস্থা ছিল। তিনি আমাকেও দোয়ার জন্য লেখেন, আমি তাকে নামাজে ইস্তিসকা পড়তে বলি। অতঃপর আল্লাহতা'লা অনুগ্রহ করেছেন। আমাদের একজন মোয়াল্লেম সাহেব বর্ণনা করেন যে, একজন স্কুল শিক্ষক মহম্মদ তুরে সাহেব আমার নিকট আসেন এবং বলেন যে আমি নিয়মিত আহমদীয়া রেডিও শুনি কিন্তু জামাতের সঙ্গে কোন যোগাযোগ ছিল না। একদিন শুনি, জামাতের খলিফা ঐ এলাকাতে বৃষ্টির জন্য খাস দোয়া করেছেন। তারপর শুনেছেন যে মালি এলাকার আমির সেই এলাকার সফরে আসছেন। অতঃপর মনে বাসনা হল যে, তিনি স্বয়ং তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করেন। অতঃপর ফারাকো গ্রাম যেখানে প্রোগ্রাম ছিল সেখানে তিনি পৌঁছে যান। সেখানে গিয়ে তিনি বআমিনর সাহেবের নিকট শুনেছেন যে, বৃষ্টির জন্য খলিফাতুল মসীহ দোয়া করেছেন। এবং বিশেষ নামাজ পড়ান। তিনি মনে মনে করেছিলেন যে এবছর যদি অসাধারণ ভাবে বৃষ্টি হয় তাহলে তা দোয়ার কল্যাণে হবে। কেননা অনেক বছর ধরে ভালো বৃষ্টি হয়নি। বৃষ্টির যখন আবহাওয়া শুরু হল তখন দু তিন দিন ছাড়া ছাড়া খুব বৃষ্টি লক্ষ্য করলেন। তিনি এ কথার সাক্ষী যে বিগত দশ বছরে এমন বৃষ্টি হয়নি। আজ তিনি এজন্য সেখানে এসেছেন যেন তিনি আহমদীয়াতে প্রবেশ করেন, কেননা খোদা খলিফার সঙ্গে আছেন। আলহামদুলিল্লাহ এখন এই গ্রামে মানুষ প্রচুর পরিমাণে বয়াত নিচ্ছেন।"

(আলফজল ইন্টারন্যাশনাল ৩রা আগষ্ট, ২০১৮, পৃষ্ঠা-১৮)

হুজুর আনোয়ার (আইঃ) রিভিউ অফ রিলিজিয়নস্ এর পক্ষ থেকে God Summit এর অনুষ্ঠানের সময় স্বীয় বিশেষ বার্তায় কিছু ঘটনার কথা উল্লেখ করেন। তার মধ্যে থেকে কয়েকটির উল্লেখ করছি।

হুজুর বলেন আইভরি কোস্ট এর একটা ঘটনা আমাদের মোয়াল্লেম সাহেব লিখেছেন। একজন বিশ্বস্ত আহমদী তাঁর সম্পর্কে আব্দুল্লা সাহেব লিখেন যে, আমার ভাইকে এই প্রকারে পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে এবং আদালত তাকে মাদকদ্রব্য বিক্রয় করার অপরাধে ২০ বছর জেলের শাস্তি শুনিয়েছেন। তিনি বলেন যে আমি বড় চিন্তিত ছিলাম যে, আমার ভাইকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে। সে নির্দোষ। সেই কষ্টের সময় তিনি আমাকে এখানে দোয়ার জন্য লেখেন। তিনি বলেন যে খলিফাতুল মসীহকে আমি দোয়ার জন্য লিখি এবং নিজেও ভাইয়ের মুক্তির জন্য দোয়া করা আরম্ভ করি। তথাপি তার ভাইয়ের মুক্তি কোন পথ দেখা যাচ্ছিল না। তিনি বলেন আমি একদিন স্বপ্নে দেখি, তিনি আমাকে লিখছেন যে, আমি খলিফাতুল মসীহকে দেখি আপনাকে দেখি এবং আপনি বলছেন যে, চিন্তিত হয়োনা, ধৈর্য ধর, তোমার ভাই শীঘ্র মুক্তি পেয়ে যাবে। সকালে যখন ঘুম থেকে উঠি তখন আমি খুব প্রশান্ত ছিলাম এবং পূর্ণ বিশ্বাস ছিল যে ইনশাআল্লাহ তা'লা আল্লাহ কোন মোজেযা দেখাবেন। এবং আমার ভাই মুক্তি পেয়ে ফিরে আসবে। কিন্তু ভাইয়ের আর মুক্তি কোথায় হল, উল্টো তার মায়ের শরীর খারাপ হয়ে গেল। এবং তাকে শহরের বড় হাসপাতালে নিয়ে যেতে হল ও ভর্তি করে নিল। তিনি বলেন যে আমি বড় সমস্যায় জর্জরিত হয়ে পড়লাম যে পূর্বেই একটা সমস্যা ছিল আর এখন দ্বিতীয় সমস্যাও এসে পড়ল। মা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, বড় বেদনাদায়ক অবস্থা ছিল, বড় অসহায় অবস্থা ছিল, খুব চিন্তিত ছিলাম যে, সমস্যা বেড়েই চলেছে। অতঃপর আমি দোয়া করলাম, এবং তিনি বলেন যে রাত্রে ঘুমালাম এবং তাকে পুনরায় স্বপ্নে দেখলাম এবং আমি তাকে বললাম উঠো এবং গিয়ে দরজা খোলো। তিনি বলেন যে, আমি জেগে উঠলাম। একবারে জেগে উঠলাম চোখ খুললাম তো দেখলাম দরজায় কেউ কড়া নাড়া দিচ্ছে। গিয়ে

দরজা খুললাম তো দেখলাম আমার বড় ভাই দাঁড়িয়ে আছে। বললেন যে পুলিশ আজ আমাকে মুক্তি দিয়েছে। তিনি বলেন যে এ-সব কিছু আল্লাহর অনুগ্রহে , দোয়া গৃহিত হওয়ার কল্যাণে মোজেযা হয়েছে এবং যুগ খলিফার সঙ্গে সম্পর্কের কারণে মোজেযা।"

(সারোজা আলফজল ইন্টারন্যাশনাল ২৭ মে ২০২২)

(৩) আবার গামবিয়ার একটা ঘটনার উল্লেখ করে হুজুর বলেন, "একজন বন্ধু ওমর সাহেব তিনি ২০১৭ খ্রীষ্টাব্দে স্বপরিবারে বয়াত করেন। তার স্ত্রীর ইউটেরাস বা গর্ভাশয়ের ক্যানসার ছিল। সাত বছর পূর্বে সন্তানের জন্ম হয়েছিল এবং তারপর থেকে ক্যানসার হয়ে যায়। ডাক্তারগণ বলে দিয়েছিলেন যে এর কোন চিকিৎসা নেই। এবং তোমার আর সন্তান জন্ম দেওয়ার আর কোন সম্ভাবনা নেই। তার স্ত্রী এ কারনে বড় চিন্তিত থাকত। প্রথম কথা যে অসুস্থ ছিলেন, আর কোন সন্তান ও জন্ম দিতে পারবে না। জীবন মরণের প্রশ্ন। জানিনা জীবনও থাকবে কী না ! বাচ্চাটাও ছোট, তার খুশিও দেখতে পাবে কিনা, ঠিক নেই। যাই হোক বয়াত করার পর তার স্ত্রী একটা লিফলেট নেন যার উপর আমার ছবি লাগানো ছিল। তিনি বলেন যে সেই ছবি দেখে জানিনা আমার অন্তরে চিন্তা জাগলো এবং এক প্রশান্তি সৃষ্টি হল, তখন আমি দোয়াও করছিলাম এবং আল্লাহতা'লার নিকট আরও প্রশান্তির জন্য দোয়া করছিলাম। অতঃপর তিনি আমাকে চিঠি লেখেন এবং নিজের দোয়ার আবেদনের সঙ্গে রোগ ও সন্তান পাওয়ার ইচ্ছার উল্লেখ করেন। আল্লাহতা'লার করুনা এমন হলো যে, কিছুদিন পর তিনি গর্ভবতী হলেন এবং যখন ডাক্তার ও নার্সরা পরীক্ষা করলেন তখন তারা আশ্চর্য ছিলেন। তিনি তাকে বলছিলেন যে আমরা তো অসম্ভব বলে দিয়েছিলাম এবং এটা চিকি'সা শাস্ত্র অনুসারে সম্ভব ছিলনা যে এখন এখন ঐ নারীর সন্তান জন্ম হবে। অতঃপর তিনি প্রেগনেন্সী টেস্ট করার পর যখন পুনরায় ক্যানসার টেস্ট করান তখন সেটাও নেগেটিভ আসল। যাতে ডাক্তারও বড় আশ্চর্য ছিল। ডাক্তার সেই নও মোবাঈন মহিলাকে জিজ্ঞাসা করেন যে তুমি কী ঔষধ ব্যবহার করেছো যার ফলে ক্যানসারও ঠিক হয়ে গেছে আর তোমার এই সমস্যা ও কষ্ট দূর হয়ে গেছে? চিকিৎসা শাস্ত্র অনুসারে আমাদের বিশ্বাস ছিল যে এটা কোন মতেই সম্ভব না। তিনি বলেন আমি কোন ঔষধ ব্যবহার করিনি। আমি তো যুগ খলিফাকে দোয়ার জন্য লিখেছিলাম এবং নিজেও দোয়া করছিলাম আর এ-সব কিছু দোযারই কল্যাণ এবং এটাই আমার চিকিৎসা যার কারণে আল্লাহতা'লা আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন।

(সাহ্ রোজা আলফজল ইন্টারন্যাশনাল ২৭ মে ২০২২)

হুজুর আনোয়ার বলেন, মালদা জেলা পমি্চমবঙ্গ ভারতের একজন মোয়াল্লিম সাহেব, যার কিডনি নষ্ট হয়ে যায়। এটা ২০০৫ এর কথা, ডাক্তারগণ চিকিৎসার যথেষ্ট চেষ্টা করেন। কিন্তু কোন উপায় বের হচ্ছিল না। ডাক্তারগণ উত্তর দিয়েছিলেন যে আর কোন পথ নেই। ২০০৫ এ আমি যখন কাদিয়ানে যাই তখন সেখানে তার ফ্যামিলি আলাপ ছিল। তিনি তার রোগের কথা বলেন। মোয়াল্লিম সাহেব দোয়ার আবেদন জানান এবং তার কিছুদিন পর তিনি চেক আপ করানোর জন্য হাসপাতালে যান। তখন ডাক্তার আশ্চর্য ছিলেন যে কিডনি আশ্চর্য রকম ভাবে ঠিক হয়ে গেছে। আর আল্লাহর ফজলে তিনি তারপর থেকে একবারে সুস্থ আছেন । সুতরাং এ-সব কিছু হল আল্লাহর অনুগ্রহ দোয়ার সম্পর্ক যে-

" গায়ের মুমকিন কো ওহ্ মুমকিন বদল দেতি হ্যায়।" অসম্ভবকে তিনি সম্ভবে পরিণত করে দেন।

(সাহ্ রোজা আলফজল ইন্টারন্যাশনাল ২৭ মে ২০২২)

হুজুর আনোয়ারের দোয়া গৃহিত হওয়া সম্পর্কে আর ও কিছু ঘটনা যা ওকালত তা'মিল ও তানফিদ এর মাধ্যমে ওকালত তবশির লন্ডনের পক্ষ হতে আমি প্রাপ্ত হয়েছি তার মধ্যে থেকে গুটিকতক আমি উপস্থাপন করছি : -

(পত্রের মাধ্যমে প্রাপ্ত : ওকালত তবশির লন্ডন হতে প্রেরিত পত্র T-9319-19R/14-9-22 মাধ্যমে WTT-46797/25-9-22)

(৫) মোবাল্লেগ ইনচার্জ সাহেব, জেলা চন্দ্রপুর, মহারাষ্ট্র লিখেন যে : -

জামাতে আহমদীয়া বল্লারপুরের একজন নিষ্ঠাবান আহমদী যুবক মুনোয়ার আলি সাহেব যিনি ইঞ্জিনিয়ার ও বেশ কিছুদিন হতে বিভিন্ন কোম্পানিতে চাকরির জন্য ইন্টারভিউ ইত্যাদি দিচ্ছিলেন কিন্তু কোথাও সফলতা পাচ্ছিলেন না। এমতাবস্থায় হুজুর আনোয়ার মসজিদ বাইতুল ফুতুহ এর পুনঃনির্মাণের জন্য চাঁদার ঘোষণা দেন, তিনি একটা মোটা টাকা ওয়াদা স্বরূপ লিখিয়ে দেন। যদিও তার কোন চাকরি বাকরি ছিল না তার সঙ্গে সে হুজুরের নিকট দোয়ার জন্যও লিখতে থাকে। তিনি বলেন যে আমার খোদার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, আল্লাহতা'লা অবশ্যই সাহায্য করবেন। সুতরাং আল্লাহতা'লা অনুগ্রহ করেছেন, এবং কাতারে তার চাকরি হয়ে যায় এবং যত টাকা তিনি ওয়াদা লিখান তত টাকাই বেতন স্বরূপ নির্ধারিত হয়।

(৬) বুরকিনাফাসোর আমির সাহেব লেখেন : -

জিয়ানু আব্দুর রহমান সাহেব জলসা সালানা বুরকিনাফাসোর অফিসার এবছর মার্চ মাসে হুজুরের সঙ্গে মুলাকাত হয়। তখন তিনি উল্লেখ করেন আমাদের এবছর চরম গরম। যা শুনে হুজুর বলেন, আচ্ছা- তাহলে আপনি কী চান বৃষ্টি হোক? যার পর তিনি বলেন জী হুজুর ! হুজুর শুনে বললেন আচ্ছা'। সুতরাং যখন জলসা অনুষ্ঠিত হল তখন তার পূর্বের দিন তাপমাত্রা ৪২ ডিগ্রী ছিল। কিন্তু আসরের পর হালকা বৃষ্টি হয়ে আবহাওয়া মনোরম হয়ে যায়। আবার রাত্রি ৮ টা নাগাদ মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হল। এবং রাত্রি ১১ টা নাগাদ বৃষ্টি থামল। এবং হাওয়া চলার ফলে সব শুকিয়ে গেল। আর সকাল বেলা প্রোগ্রাম অনুসারে তাহাজ্জুদের নামাজ আদায় করা হল। আমার কুড়ি বছরের বেশি সময় হল এবং জামাতের পুরোনো লোকেদের নিকট জিজ্ঞাসা করেছি, সবাই বলল জলসায় কখনও বৃষ্টি হয়নি এবং এই মাসে এইভাবে বৃষ্টি হওয়া চরম অস্বাভাবিক ঘটনা। অতঃপর জলসা সালানা অফিসার সাহেব উপস্থিত সমস্ত লোকদের নিকট তার হুজুরের সঙ্গে মুলাকাত ও জলসায় বৃষ্টির জন্য দোয়ার দরখাস্ত করার ব্যাপারে জানালে পুরো পরিস্থিতিটাই বদলে যায়। সবার অন্তর দোয়া কবুলিয়াত ও খিলাফতে আহমদীয়াতের প্রতি প্রেম ও নিষ্ঠায় পূর্ণ হয়ে যায়। এবং আকাশে বহুক্ষণ ধরে 'নারা তকবির' ধ্বনিত হতে থাকে।

(৭) কঙ্গো ব্রাজবিলের শহর পয়ায়েন্ট নওয়ার এর মোবাল্লেগ সাহেব লেখেন যে :-

কঙ্গো ব্রাজবিলের পয়ায়েন্ট নওয়ার শহরে ২০১৫ সালে আহমদী মিশনের প্রতিষ্ঠার পর একদিন বাজারে পাকিস্তানি বন্ধু মহম্মদ ইকবাল সাহেবের সঙ্গে মুলাকাত হয়। প্রথমে তো খুব আনন্দের সঙ্গে সাক্ষাত করেন এবং ফোন নম্বর নেন। কিন্তু যখন আমি নিজের আহমদী হওয়ার কথা জানালাম তখন তার হাব ভাবে হঠাৎ পরিবর্তন চলে এলো। সময় অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে যখনই তাকে মিশনে আসার জন্য দাওয়াত দিতাম কোন না কোন বাহানা করে দিত। ২০১৭ সালে হঠাৎ তিনি চাকুরিহীন হয়ে পড়েন। এবং একটা বড় ধরণের টাকা তার আটকে যায়। সে চরম সমস্যার সম্মুখিন হয় এবং প্রত্যেক স্থানে চেষ্টা করে কিন্তু অসফল হয়। অতঃপর ২০১৮ সালের জানুয়ারী মাসে হঠাৎ করে চরম কষ্টের মধ্যে তার ফোন আসে যে, আমি আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য মিশনে আসতে চাই। এখানে এসে নিজের কষ্টের কথা শুনালেন, আর বললেন আপনি আমাকে পাসপোর্ট বানিয়ে দিন। বলতে লাগল যে আমাকে সবাই বলল যে এ-ব্যাপারে জামাতে আহমদীয়া-ই তোমাকে সাহায্য করতে পারে।

সুতরাং তার অনলাইন পাসপোর্টের জন্য আবেদন পাঠানো হলে কিছুদিনের মধ্যে পাসপোর্ট তৈরী হয়ে চলে আসে। পাসপোর্ট হওযার পরেই জামাতের ব্যাপারে তার অন্তর সরল হতে লাগে। সে বেশির ভাগ সময় মিশন হাউসে আসতে আরম্ভ করল এবং সঙ্গে বসে খাওয়া ও শুরু করল। অতঃপর ২০১৮ সালে কঙ্গো জলসা সালানায় অংশ গ্রহণ করে। যেহেতু তার চাকরি শেষ হয়ে গিয়েছিল এবং একটা বড় অর্থ সেখানে আটকে গিয়েছিল। যেটা পাওয়ার কোন পথ বের হচ্ছিল না। এভাবেই ১৫টা মাস অতিবাহিত হয়ে গেল এবং তার চিন্তা বেড়েই চলেছিল।

একদিন মিশন হাউসে বসে বসে খুব চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং বলে যে আপনি নিজেদের জামাতের খলিফা সাহেবকে আমার পক্ষ থেকে দোয়ার চিঠি লিখুন। এবং বারংবার জোর দিতে থাকে। আমি বললাম যে আমরা এখন হুজুরের নিকট দোয়ার চিঠি লিখে দেব। কিন্তু স্মরণ রাখুন যে আপনি আহমদী হোন বা না হোন কিন্তু এই দোয়া কবুল হওয়া আপনার জন্য আহমদীয়াতের সত্যতার প্রতি একটি নিদর্শন হবে। কেননা আপনার টাকা ফেরত পাওয়ার জন্য আপনার বিন্দুমাত্র আশা নেই। সুতরাং সেই রাত্রেই দোয়ার চিঠিটি ফ্যাক্স করে দিই এবং অপেক্ষা করতে লাগলাম আল্লাহতা'লা শীঘ্রই স্বীয় অনুগ্রহ করুন।

খোদাতা'লাও বড় মর্যদাবান এবং তারও নিজ খলিফার সঙ্গে চরম ভালোবাসা রয়েছে। খোদাতা'লার অনুগ্রহ হল এবং শেষ পর্যন্ত চারদিন পর সে হাসি মুখে মিশন হাউসে আসলো। এবং বলতে লাগলো যে, আমরা যে রাত্রে খলিফা সাহেবকে চিঠি ফ্যাক্স করি তার পরের দিনই আমার অফিস থেকে ফোন আসে যে আপনি চলে আসুন এবং পুনরায় চাকরিতে যোগ দিন আর তিনি তার সমস্ত অর্থ ফেরত পাওয়ার দৃঢ় আশ্বাস দেন। আমি আলহামদুলিল্লাহ পড়লাম এবং বললাম দেখুন আল্লাহতা'লা নিজ করুণায় এবং প্রিয় খলিফার দোয়ার ফলে আপনার জন্য আহমদীয়াতের সত্যতার কেমন নিদর্শন দেখিয়েছেন। ফলে উনি আহমদীয়াতের অনেক নিকটে চলে আসেন। আল্লাহতা'লা তার হেদায়েতের ব্যবস্থা করুন, আমিন।

(ওকালত তবশির, লন্ডন)

(৮) জার্মানী হতে ইবরার আহমদ সাহেব লেখেন আমি জার্মানী আসার পর Burger King এ (ফাস্ট ফুড রেস্টুরেন্টে) কাজ করা আরম্ভ করি, একদিন তিনি বুলেটিনে হুজুর আনোয়ারের ইরশাদ পাঠ করেন যে, "এমন সদস্য যারা শুকরের মাংস ও অ্যালকোহলের স্থানে কাজ করে তাদের নিকট হতে চাঁদা নেবেন না।"

তিনি লেখেন যে, হুজুর আনোয়ারের নির্দেশ পড়ে আমার জ্ঞান হারিয়ে গেল সারা রাত অস্থিরতা ও নফল পড়ার মাধ্যমে কাটালাম যে হে আল্লাহ তুমি আমার অবস্থা সম্পর্কে অবগত আছো সেই সময়কালে হুজুর আনোয়ারের নিকট নিয়মিত পত্র লিখতে থাকলাম। এই চিন্তা করতে লাগলাম যে এত ছোট শহরে আমাকে আর কে কাজ দেবে? আর সেই সময়ে জামাতের লোকেরা বলতে লাগলো আমাদেরকে ওসিয়্যাতের জন্য উপদেশ দাও কিন্তু এখন নিজের ওসিয়্যাত কি করে বাঁচাবে ?

আর ঠিক সেই সময়ে হুজুর আনোয়ারের পক্ষ হতে পত্রের উত্তর পেলাম। যাতে হুজুর আনোয়ার বলেন যে "আল্লাহতা'লা আপনাকে অবশ্যই বরকত পূর্ণ কাজ দান করবেন।"

সুতরাং তৎক্ষনাত কর্মস্থলে গিয়ে

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

"সেই লোকগুলি তোমাদের আদর্শ যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, 'কোন ব্যবসা, বানিজ্য ও কেনাবেচা তাদেরকে আল্লাহ্র যিকর বা স্মরণ থেকে বাধা দেয় না।" *(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১০৪)*

দোয়াপ্রার্থী: Nurjahan Begum, Kolkata (W.B)

চাকরি হতে জবাব দিয়ে দিলাম আর বললাম এটা আমার শেষ দিন।

তারা আমাকে ভয় দেখালো যে টাকা পাবেনা খুব কষ্টও পাবে, কিন্তু আমি সেখানে ইস্তফা দিয়ে ঘরে চলে এলাম। ঘরে এসে নিজের লেটার বক্স খুললাম তখন তাতে পোষ্টাল ডিপার্টমেন্ট থেকে চিঠি এসেছিল যে আগামী কাল হতে কাজে চলে এসো। সঙ্গে সঙ্গে খোদার আস্তানায় মাথা ঝুঁকে গেল যে একদিন পূর্বেই কাজ হারিয়েছি আর পরের দিনই নতুন কাজ পেয়ে গেলাম।বর্তমানে আল্লাহতা'লা গাড়িও দান করেছেন এবং আল্লাহতা'লার ফজলে ওসিয়্যাতের সেক্রেটারী রূপে ওসিয়্যাতের টার্গেট ও পুরণ করার সৌভাগ্য হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ।

শ্রোতামণ্ডলী! এই সমস্ত ঘটনাবলী শুনে হজরত মসীহে মাওউদ (আঃ) এর ভাষায় অন্তর হতে এই আওয়াজ বের হয় -

“কুদরত সে আপনি যাত কা দেতা হ্যায় হক সবুত
উস বেনিশাঁ কি চেহ্‌রা নুমায়ী এহী তো হ্যায়
জিস বাত কো ক্যাহে কে করুঙ্গা ম্যায় এ জরুর
টলতি নেহি ও বাত খোদায়ী এহী তো হ্যায়
গায়ের মুমকীন কো এ মুমকীন মে বদল দেতী হ্যায়
্এ্যায়ে মেরে ফিলসফিয়োঁ! যোরে দোয়া দেখো তো।”

জামাতে আহমদীয়া আল্লাহতা'লার ফজলে পৃথিবীতে একমাত্র জামাত যার মা-বাপের চেয়েও বেশি ব্যাথা অনুভবকারী ও দোয়াকারী এক সত্তা রয়েছে। রাত্রে যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়ে তখন তিনি জেগে থাকেন সমস্ত পৃথিবীতে বসবাসকারী মানুষদের জন্য নিজ প্রভুর নিকট প্রার্থনা করেন। কেবল নিজেরাই নয় বরং অন্যেরাও এ-কথাকে অনুভব না করে পারে না।

শ্রোতামণ্ডলী! আমি এখন হজরত আমিরুল মোমেনীন (আইঃ) এর পক্ষ থেকে দোয়ার তাহরীক ও উপদেশ সম্পর্কে কিছু উদ্ধৃতি উপস্থাপন করবো।

একুশে মে ২০০৪ এ জুমার খোতবায় হুজুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন,

“স্মরণে রেখো যে, তিনি স্বীয় অঙ্গীকারে সত্য খোদা। তিনি আজও নিজ প্রিয় মসীহের এই প্রিয় জামাতের উপর হাত রেখেছেন। তিনি আমাদেরকে কখনো পরিত্যাগ করবেন না, কখনো পরিত্যাগ করবেন না, কখনো পরিত্যাগ করবেন না। তিনি আজও নিজ মসীহের সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার সমূহকে সেভাবেই পূর্ণ করছেন যেভাবে তিনি পূর্বের খিলাফতের সঙ্গে করেছেন। তিনি আজও সেভাবেই নিজ আশিস ও কল্যাণ ঘোষিত করছেন যেভাবে তিনি পূর্বে ভূষিত করে এসেছেন এবং ভবিষ্যতেও করতে থাকবেন ইনশাআল্লাহ। ....সুতরাং দোয়ায় রত হয়ে তার প্রতি অবনত থেকে তার অনুগ্রহ যাচনা করে সর্বদা তার আস্তানায় পড়ে থাকুন। তাহলে কেউ আপনার চুলও বাঁকা করতে পারবে না। আল্লাহতা'লা সবাইকে তার তৌফিক দান করুন। আমিন।

(খোতবা জুমা ২১ মে ২০০৪ খ্রীষ্টাব্দ, প্রকাশনা আলফজল ইন্টারন্যাশনাল ৪ জুন ২০০৪, পৃষ্ঠা ৯)

হুজুর আরোও বলেন -

“যেখানে যেখানে আহমদীরা অত্যাচারের স্বীকার হচ্ছেন তারা স্মরণে রাখুন এটা শয়তানের সঙ্গে শেষ যুদ্ধ। আর আল্লাহতা'লার সন্তুষ্টির জন্য আপনি সেই সেনাদলে প্রবেশ করেছেন যা এই যুগের ইমাম প্রস্তুত করেছেন। সেজন্য নিজ ঈমানকে শক্ত করে আল্লাহতা'লার নিকট হতে দৃঢ় প্রত্যয় ও ধৈর্য চেয়ে সর্বদা ধৈর্য ও সাহসের পরিচয় দিন। আল্লাহতা'লার সমীপে আরোও অবনত হোন, ইনশাআল্লাহতা'লা শেষ বিজয় হজরত মসীহে মাওউদ (আঃ) এর জামাতেরই। যেরূপে তিনি (আঃ) বলেছেন, এই শয়তানী ও বিদ্রোহী শক্তিগুলিকে পরাস্ত করতে আল্লাহতা'লা এই সিলসিলাকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। কিন্তু আমাদেরকে সর্বদা একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, বাইরের শয়তানকে পরাস্ত করতে হলে অভ্যন্তরের যে শয়তান রয়েছে তাকেও অধীনস্ত করতে হবে। কেননা আমাদের বিজয় মসীহে মাওউদ (আঃ) এর সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার কারনে বাহ্যিক অস্ত্রের দ্বারা হবে না, বরং দোয়ার মাধ্যমে হবে। আর দোয়া গৃহিত হওয়ার জন্য নিজেকে খোদাতা'লার সন্তুষ্টি অনুসারে পরিচালনকারী বানানোর প্রয়োজন আছে আর তার জন্য প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জেহাদেরও একান্ত প্রয়োজন।

(খুতবা জুমা ৬ ই মার্চ ২০০৯)

হুজুর নূর বলেন,

“খোদাতা'লা যখন নিজ বান্দার এত নিকটে হয়ে যান যে, তিনি ও বান্দা পরস্পর মিলে যান। অতঃপর বান্দা দোয়া করলে এমন অবস্থায় কৃত দোয়া এমন এমন আশ্চর্য মোজেযা বা অলৌকিকতা প্রদর্শন করে যা একজন মানুষের চিন্তায়ও আসতে পারে না। সুতরাং এমন অবস্থা সৃষ্টি করার প্রয়োজন আছে - এটা হজরত মসীহে মাওউদ (আঃ) বর্ণনা করেছেন। পৃথিবীর স্বাভাবিক অবস্থাতেও একে প্রত্যক্ষ করে দেখে নিন যে, কষ্টের সময় বিশুদ্ধ হয়ে আল্লাহতা'লার নিকট যখন কেউ অবনত হয় যেহেতু সেসময় পার্থিব সমস্ত কিছু হতে সে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় পৃথিবীর প্রতি কোন প্রকার মনোযোগ থাকেনা, কষ্টের মধ্যে নিপতিত থাকে সমস্যায় জর্জরিত থাকে আল্লাহতা'লার দিকে ঝুঁকে থাকে, কেবলমাত্র আল্লাহতালার সত্তাই সম্মুখে থাকে। এ কারণে বেশিরভাগ মানুষ যারা এমন অবস্থায় দোয়া করেন তারা দোয়া গৃহিত হওয়াকে প্রত্যক্ষ করে। অতএব মানুষ যদি আল্লাহতা'লার রহমানিয়্যাতকে সর্বদা সম্মুখে রেখে তার নিকটতর হওয়ার চেষ্টা করে একটা কাজ সমাধা হওয়ার পর, একটা কষ্ট দূর হওয়ার পর তার নিকটতর হওয়ার চেষ্টাকে পরিত্যাগ না করে তাহলে আল্লাহতা'লা দোয়া গৃহিতকরণের স্থায়ীরূপে দৃষ্টান্ত দেখান, দোয়া কবুল হওয়ার দৃশ্যও দেখান। অতএব আল্লাহতা'লার অনুগ্রহ সমূহকে সর্বদা নিজের উপর বর্ষণশীল রাখার জন্য আবশ্যিক যে আল্লাহতা'লার সর্বদা নিকটতর থাকার চেষ্টা করতে হবে। তখন এমন পরিস্থিতিতে আল্লাহতা'লা সমস্ত পার্থিব বস্তু সমূহকে এবং পৃথিবীর যা কিছু জিনিস আছে সে সব কিছুকে সেই বান্দার দোয়া চাওয়ার কারণে তার প্রয়োজন মিটানোর কাজে নিয়োগ করে দেন। পৃথিবী ও আকাশের সমস্ত মাধ্যমকে নিজ বান্দার সাহায্যের জন্য দাঁড় করিয়ে দেন। কখনো আল্লাহতা'লা বান্দার দোয়া কবুল করে মেঘমালা হতে বৃষ্টি বর্ষান, আবার কখনো শত্রুর জন্য কৃত নিজ বান্দার বদদোয়া শ্রবণ করে অনাবৃষ্টি ও বিপদাপদেরে ব্যবস্থা করে দেন। অতএব একজন মোমিনের অন্তরে এই যে অবস্থার সৃষ্টি হওয়া উচিত এটাই সেই অবস্থা যা প্রত্যেক আহমদীর সর্বদা নিজ অন্তরে সৃষ্টি করা ঋুচিত”।

(খুতবা জুমা ২২ সেপ্টেম্বর ২০০৬)

হুজুর বলেন -

“ আমরা না কেবল নিজের বেঁচে থাকার জন্য, নিজ সত্তায় বেঁচে থাকার জন্য, নিজ বংশের বেঁচে থাকার জন্য, জামাতে আহমদীয়ার বেঁচে থাকার জন্য দোয়ায় মনোযোগী হওয়া উচিত বরং সমগ্র মুসলিম জাতি এবং তার থেকে উর্ধ্বে সমগ্র মানব জাতির বেঁচে থাকার জন্য দোয়া করা উচিত। সুতরাং প্রত্যেক আহমদীর এই দিনগুলিতে অর্থাৎ সর্বদা, (এবং আজকাল বিশেষ ভাবে যখন অবস্থা খুব খারাপ হয়ে যাচ্ছে নিজ প্রভুর নিকট অবনত হয়ে দোয়া করা উচিত। অসহায়ের ন্যায় তাকে ডাকতে থাকুন, অস্থির হয়ে তাকে ডাকুন। বর্তমানে উম্মতে মোহাম্মদীয়া যে সময়ের মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত হচ্ছে এবং মুসলিম দেশ সমূহ যে সমস্যার মধ্যে জর্জরিত আছে তার সমাধান দোয়া ব্যতিত আর কিছু নেই। অতএব মুসলিম জাতির জন্য দোয়া করুন যে, আল্লাতা'লা তাদেরকে অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক ফেতনা হতে মুক্তি দান করুন। তাদেরকে সেই বার্তাকে বোঝার সৌভাগ্য দিন যা মহানবী (সাঃ) আজ থেকে চোদ্দ শত বছর আগে দিয়েছিলেন। এও দোয়া করুন যে, আল্লাতা'লা এই পৃথিবী হতে যুলুম ও নির্যাতনকে নিঃশেষ করে দেন। মানুষ নিজ সৃষ্টিকর্তা খোদার প্রতি মনোযোগ সৃষ্টিকারী হয়। তাকে চিনতে পেরে নিজেদের জিদ ও আমিত্বের জাল থেকে বাইরে বের হয়। খোদাতা'লার অসন্তুষ্টি ও ক্রোধকে আমন্ত্রণ না জানায় বরং তার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধকারী হয়। আল্লাহতা'লার সেই বার্তাকে অনুধাবনকারী হয়, এই কথাকে অনুধাবনকারী হয় যে আমার দিকে এসো বিশুদ্ধভাবে আমাকে আহ্বান করো যেন তোমাদের দোয়া সমূহকে শুনে এই পৃথিবী যাকে তোমরা সর্বস্ব জ্ঞান করছো যেটা প্রকৃতপক্ষে অস্থায়ী ও গুটিকতক দিনের মাত্র তোমার জন্য শান্তির নিবাস করে দিই যেন তোমরা সৎকর্মের কারণে আমার স্থায়ী জান্নাতের ওয়ারিশ হতে পারো।

.... আবার যেমনটা আমি বলেছি এই পৃথিবীর জন্য মানবতার জন্যও দোয়া করুন। পৃথিবী বড় দ্রুততার সঙ্গে নিজ আমিত্বের ও জিদের কারনে ধ্বংসের গর্তের দিকে ধাবিত হচ্ছে। নিজ খোদাকে ভুলে গিয়েছে এবং আল্লাহর শাস্তিকে ডাকছে। অত্যাচার এত বেড়ে গিয়েছে যে তাকেও ইনসাফের নাম দেওয়া হচ্ছে তাদের প্রতি আল্লাহ করুণা করুন, আমিন।

আমি পূর্বেও বলেছি যে নিজের জন্য ও জামাতের জন্য অনেক দোয়া করুন। আল্লাহতা'লা আহমদীয়াতের বিরোধীদের ও শত্রুদের বিফল করুন। যেমন সর্বদা ঐশী জামাতের সঙ্গে হয়ে এসেছে যে, বিরোধীতার সম্মুখীন হতে হয় আর এটা তো চরতে থাকবে এবং সর্বদা হয়ে আসছে - তবেই উন্নতি হয়। এটা ও সত্যতার একটি প্রমাণ যে যখন অন্যের কাছে প্রমাণ থাকে না তখন তারা কঠোরতা অবলম্বন করে। অতএব এই বিরোধীতা হতে আহমদীরা ভয় পায় না এবং ভষ্যিতেও পাবে না ইনশাআল্লাহ। এই বিষয়টি ঈমান ও জামাতের উন্নতির কারণ হয়ে থাকে। এবং এই সমস্ত বিরোধীতা সর্বদা উর্বরকের কাজ করে। কিন্তু এই বিরোধীতার কারণে বিরোধীদের যে মন্দ পরিণাম আসার থাকে মানবতার কারণে আমরা এমন লোকেদের জন্যও দোয়া করি। আল্লাহতা'লা তাদেরকেও জ্ঞান দান করুন এবং তারা নিজেদের মন্দ পরিণামের পূর্বে আল্লাহতা'লার আদেশাবলীর উপর আমল করে তা থেকে রক্ষা পায়। আর নিজেদের জন্য দোয়া করা উচিত যে আমাদের অলসতা ও ভুলের কারণে আমরা আল্লাহতা'লার সেই সমস্ত পুরস্কার হতে বঞ্চিত না হয়ে যায় যা আল্লাহতা'লা আমাদের জন্য নির্ধারিত করেছেন। শত্রুদের প্রত্যেক কু-মন্ত্রণা ও প্রত্যেক প্রচেষ্টা আমাদের ঈমান বৃদ্ধি এবং উন্নতির কারণ হয়। আমাদের প্রত্যেকে দৃঢ়তা প্রদর্শনকারী হই, আমাদের নেক ইচ্ছা সমূহ সর্বদা আল্লাহতা'লার নিকট কবুলিয়াতের মর্যাদা লাভ করে এবং তার কারনে আমরা আল্লাহতা'লার ভালোবাসা লাভকারী হই। আল্লাহতা'লা আমাদেরকে নিজের সমস্ত নেক গুণাবলীর আশ্রয়ে নিয়ে নেন যার জ্ঞান আমাদের আছে ও যার জ্ঞান নেই। তিনি নিজ সমস্ত সৃষ্টির প্রত্যেক ক্ষতি হতে আমাদের রক্ষা করুন। আমিন।

(খুতবা জুমা ১১ ই আগষ্ট ২০০৬)

ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহে রব্বিল আলামিন।

যুগ ইমামের বাণী

তোমরা একথা ভুলে যেও না যে, খোদা তা'লার কৃপা ও অনুগ্রহ ব্যতিরেকে তোমরা আদৌ জীবিত থাকতে পার না। (মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬২৯)

দোয়াপ্রার্থী: Abdus Salam, Nararvita (Assam)

যুগ ইমামের বাণী

যাঁর আশিস ও কল্যাণের ধারা সদা প্রবাহমান, তিনিই হলেন জীবিত নবী। (মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬২৯)

দোয়াপ্রার্থী: Qazi Abdur Rashid, Basantapur, 24 PGS (S)

প্রসঙ্গ সন্তান প্রতিপালন, আহমদী মায়েদের দায়িত্বাবলী, ঐশী প্রেম, নামায, তিলাওয়াত, খিলাফতের প্রতি অনুরাগ এবং উন্নত নৈতিকতা।

মূল-ডক্টর মনসুরা এলাহদ্দীন সাহেবা, সদর লাজনা ইমাউল্লাহ্, কাদিয়ান অনুবাদক: মৌলবী মুহাম্মদ সাবির আলি মোল্লা মুবাল্লিগ সিলসিলা

رَبَّنَاهَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَ ذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا

(সূরা ফুরকান, আয়াত নং- ৭৫)

তোমার গর্ভ হতে জন্ম নিয়েছে সেই ধার্মিক যাদের মাধ্যমে ইসলামের কল্যাণ সাধিত হবে এ ভাবে তোমাদের গৃহকোণ আলোকোজ্জ্বল হয়ে উঠুক পৃথিবী তাদের দ্বারা হেদায়েতের নূরে আলোকিত হবে।

সম্মানীয়া সদর সাহেবা ও প্রিয় বোনেরা ও বাচ্চারা! আমার বক্তব্যের বিষয় হল "সন্তান প্রতিপালনে আহমদী মায়েদের দায়িত্ব- ঐশী প্রেম, নামাজ, কুররান পাঠ, খিলাফতের প্রতি ভালোবাসা ও উত্তম চরিত্রের আলোকে।"যে আয়াতটি আপনারা শুনেছেন তার অনুবাদ হল -

"হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদের জীবনসঙ্গী ও সন্তান সন্ততি হতে আমাদেরকে চোখ জুড়ানোর (উপকরণ) দান কর এবং আমাদের (প্রত্যেককে) মুত্তাকীদের ইমাম বানিয়ে দাও।"

প্রিয় বোনেরা! আমরা আল্লাহ্ তাআলার যতই শুকরিয়া আদায় করি না কেন তথাপি কম হবে, কেন না তিনি আমাদেরকে এই যুগের ইমামকে চেনার এবং তাঁর উপর ঈমান আনার তৌফিক দান করেছেন। আজ থেকে এক শত বছর পূর্বে চারিদিকে অন্ধকারের যুগ চলছিল আর ইসলামের নৌকা সেই অন্ধকারের ঘূর্ণিপাকে নিপতিত হয়েছিল, ঠিক সেই সময়ে আল্লাহ্ তাআলা সৈয়্যদনা হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) কে পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। তিনি (আ.) আল্লাহ্ তাআলার সাহায্যে বিরোধীতার এই তীব্র ঘূর্ণী ঝড়ের মুকাবিলা করে ইসলামের তরণীটি ডুবে যাওয়া থেকে রক্ষা করেন। আর খোদাতাআলার ধর্ম ইসলামের জন্য আপন ধন-দৌলত, সম্মান ও সন্তানদেরকে উৎসর্গকারী এমন একটি জামাত প্রতিষ্ঠা করেন যাকে বর্তমানে শত্রুরাও মানতে বাধ্য যে দ্বীন ইসলামের সেবাতে সদা প্রস্তুত যদি কোন জামাত থেকে থাকে তাহলে সেই জামাতটি হল আহমদীয়া মুসলিম জামাত।

প্রিয় বোনেরা! এই জামাতের সদস্যা হওয়ার জন্য আমাদের উপরে যে দায়িত্ব বর্তায় আমি আমার বোনেদেরকে সেই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

এটি এক চিরন্তন সত্য এবং বিশ্ব ইতিহাস সাক্ষী যে, কোন জাতির উন্নতির চরম সীমায় পৌঁছানোর গোপন চাবিকাঠি নারীর বুদ্ধি, সাহসিকতা এবং উন্নত চরিত্রের সাথেই সম্পর্কযুক্ত। আবার একইভাবে আমরা যদি কোন জাতির অধঃপতনের কারণ খুঁজি, তাহলে তার মধ্যেও নারীর সংশ্লিষ্টতা দেখতে পাই। সৈয়্যদনা হযরত মুসলেহ মাওউদ রা. এর বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে জামাতের নারীদের ধর্মীয় ও শিক্ষাগত মান উন্নয়নের জন্য লাজনা ইমাইল্লাহ্র প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর (রা.) হৃদয়ে নারীদের প্রশিক্ষণের জন্য অন্তহীন আকাঙ্খা ছিল। তিনি (রা.) তাঁর দূরদর্শি দৃষ্টি দ্বারা অনুভব করেছিলেন যে, নারীদের সংস্কার না হওয়া পর্যন্ত জামাতের উন্নতি সাধন হবে না। তিনি (রা.) বলেন :-

"নারীদের প্রধান দায়িত্ব হল শিশুদের প্রতিপালন, আর এই দায়িত্ব জেহাদের থেকে কোন অংশে কম নয়। শিশুদের প্রতিপালন ভালো হলে জাতির ভিত মজবুত হয় ও জাতির বিকাশ ঘটে এবং তাদের শিক্ষা ভালো না হলে একদিন না একদিন অবশ্যই সেই জাতি ধ্বংস হয়ে যায়। তাই কোন জাতির উন্নয়ন ও ধ্বংস নির্ভর করে সেই জাতির নারীদের উপর। আজকালের মায়েরা যদি তাদের সন্তানদেরকে সাহাবায়ে কেরামের মতো প্রশিক্ষণ দেয়, তাহলে কি সম্ভব নয় যে তাদের সন্তানেরাও সাহাবায়ে কেরামের সন্তানদের মতো জাতির সাহসী সৈনিক হত। খোদা না করুন বর্তমান যুগে আহমদীয়া জামাতে যদি কোন সমস্যা দেখা দেয় তার জন্য নারীরাই দায়ী থাকবে।"

(আল আযহার পৃ. ৩২৭)

সন্তানদের প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল পিতা-মাতার দোওয়া। আল্লাহ্তাআলা সন্তানের জন্মের আগে থেকে জীবনের শেষ পর্যন্ত দোওয়া করার নির্দেশ দিয়েছেন। মহান আল্লাহ্তাআলা নেক ও পবিত্র সন্তান লাভের জন্য সন্তান জন্মানোর আগে থেকেই দোওয়া শিখিয়েছেন। রাব্বি-হাবলি মিল্লাদুনকা যুর্রিয়াতান তইয়্যেবাতান ইন্নাকা সামিউদ্দুয়া।

(সূরা আলে ইমরান আয়াত নং ৩৯)

অনুবাদ: হে আমার প্রভু প্রতিপালক! তুমি তোমার নিজ পক্ষ থেকে আমাকে পবিত্র সন্তান সন্ততি দান কর, নিশ্চয় তুমি অধিক দোওয়া গ্রহণকারী।

অতঃপর পরবর্তিতে সন্তানদের পুণ্যবান ও তাদের মাধ্যমে চোখ শীতল হওয়ার উপকরণ সৃষ্টি হওয়ার জন্যও দোওয়া শিখিয়েছেন।

রাব্বানা হাবলানা মিন আযওয়াজিনা ওয়া যুর্রিয়াতেনা কুর্রাতা আয়ুনীন ওআয্আলনা লিল মুত্তাকিনা ইমামা ।

(সূরা ফুরকান আয়াত নং ৭৫)

অনুবাদ :- হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদের জীবনসঙ্গী ও সন্তানসন্ততি হতে আমাদেরকে চোখ জুড়ানোর (উপকরণ) দান কর এবং আমাদের (প্রত্যেককে) মুত্তাকিদের ইমাম বানিয়ে দাও।

তাই মায়েদের প্রথম কর্তব্য হল সমস্ত প্রচেষ্টায় তাদের জন্য দোওয়া করা। জন্মের আগে থেকেই এই দোওয়াকে নিজের পর্দা ও আচ্ছাদন বানাও আর দোওয়া কর যে, হে আল্লাহ্ এই সন্তান যাদেরকে তুমি আমাদের দিয়েছ, তাদের সঠিকভাবে লালন-পালন এবং সঠিকভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়ার শক্তি আমাদের নেই, তাই তুমি আমাদের তৌফিক দান কর আমরা যেন তাদেরকে সঠিক প্রশিক্ষণ দিতে পারি এবং তাদেরকে তুমি তোমার ধর্মের ভক্ত বানাও এবং এই শিশুরা আমাদের চোখের শীতলতার কারণ হয়ে তোমার নৈকট্য পেতে থাকুক। সৈয়্যদনা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) শিশুদের সঠিক প্রশিক্ষণের জন্য দোওয়া করার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি (আ.) শিশুদেরকে দৈহিক শাস্তি দেওয়া ও অতিরিক্ত বকা-ঝকা করা পছন্দ করতেন না এবং সর্বদা বলতেন যে বাচ্চাদের জন্য দোওয়া করাকে তোমরা প্রাত্যহিক কর্ম বানিয়ে নাও। তাঁর (আ.) এর বাস্তব জীবনের আদর্শ আমাদের সামনে রয়েছে। তিনি (আ.) আপন সন্তানদের জন্য দোওয়া করতে গিয়ে আপন কবিতাতে বলেন:-

"তাদেরকে সৌভাগ্য, ধর্ম ও সম্পদ দান কর
তাদেরকে নিজেই হিফাজত কর,
তাদের প্রতি আপনার রহমত বর্ষিত কর।
তাদেরকে সমৃদ্ধি ও হেদায়াত এবং সম্মান ও দীর্ঘায়ু দান কর
হে আমার পবিত্র খোদা! এই দিনটিকে আমার জন্য কল্যাণমন্ডিত করে তোল।
তাদেরকে শয়তান থেকে দূরে রেখে আপনার নৈকট্যে স্থান দিও
তাদের প্রাণ নূরে ভরে রেখো, হৃদয়ে আনন্দ রেখো,
তাদের প্রতি তুমি তোমার করুণা ও রহমত অবশ্যই দান কর,
হে আমার পবিত্র খোদা! এই দিনটিকে আমার জন্য কল্যাণমন্ডিত করে তোল।

দোওয়ার পাশাপাশি শিশুদেরকে ভালো কথার দ্বারা উপদেশ দেওয়া এবং তাদের সামনে নিজের বাস্তব উদাহরণ তুলে ধরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আঁ হযরত (সা.) বলেছেন:-

"আকরিমু আওলাদাকুম"

এই শব্দের মধ্যে এই তাৎপর্য বর্ণনা করা হয়েছে যে, আপন-আপন সন্তানদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর, ফলে তাদের মধ্যেও আত্মসম্মানবোধ জেগে উঠবে। যখন আমরা আমাদের সন্তানদের সম্মান করব এবং তাদেরকে ভালোবাসার সহিত ভালো কথার দ্বারা উৎসাহিত করব, তখন তারাও আমাদেরকে তাদের প্রকৃত হিতাকাঙ্খী হিসাবে স্মরণ করবে এবং পিতা-মাতার আনুগত্য করবে।

হযরত উম্মুল মুমিনিন (রা.) তাঁর সন্তানদেরকে যে পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন সে সম্পর্কে হযরত নওয়াব মুবারকা বেগম সাহেবা (রা.) বলেন,-

"সন্তানের প্রতি সর্বদা পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা প্রদর্শন করে পিতা-মাতার আস্থার উপরে শালীনতা বজায় রাখা, এটাই ছিল তাঁর প্রশিক্ষণের মূল নীতি। তাই সন্তানের প্রতি পূর্ণ আস্থা রাখুন, তাদেরকে সন্দেহের চোখে দেখবেন না। মিথ্যার প্রতি ঘৃণা, সম্মান ও ঐশী সম্পদ ছিল তাঁর প্রথম পাঠ। তিনি (রা.) আমাদেরকে সব সময় এই কথা বলতেন যে, শিশুর মধ্যে এই অভ্যাসটি তৈরী কর, সে যেন কথা শোনে। তার পরে তার মধ্যে যদি শৈশবের দুষ্টুমি আসে, ভয় নেই। যখনই এটি বন্ধ করার কথা বলা হবে তখনই বন্ধ করে দেবে আর সংশোধন করে নেবে। তিনি (রা.) বলতেন যে, একবার আনুগত্য করার অভ্যাস হয়ে গেলে সর্বদা সংশোধন করার আশা থাকে। এটাই তিনি আমাদের শিখিয়ে ছিলেন এবং আমরা কখনো কল্পনাও করিনি যে আমরা আমাদের পিতা-মাতার অনুপস্থিতিতে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করতে পারি।"

হযরত উম্মুল মুমিনিন (রা.) সর্বদা বলতেন যে, আমার বাচ্চারা কখনো মিথ্যা কথা বলে না, আর আমাদের প্রতি এই বিশ্বাসই আমাদেরকে মিথ্যা হতে রক্ষা করত আর মিথ্যার প্রতি ঘৃণা তৈরি করত।

সৈয়্যদনা হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) জামাতের নারী ও শিশুদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য এত চিন্তা করতেন যে, তিনি নারীদের জন্য এই বিষয়ে অনেক বক্তব্য দিয়েছেন, যেগুলি আমাদের জন্য পাথেয় এবং দিশাস্বরূপ। এইগুলি বারবার পাঠ করা আর এর উপরে আমল করা আমাদের আবশ্যকীয় কর্তব্য। তিনি (রা.) বর্ণনা করেন-

জাতির মধ্যে স্বর্গ মায়েদের মাধ্যমে তৈরী হয়। রসূলে করিম (সা.) বলেছেন, মায়েদের পদতলে স্বর্গ বিরাজ করে- এটি কত সুন্দর শব্দ। আঁ হযরত (সা.) মায়েদেরকে কতই না গুরুত্ব দিয়েছেন। সাধারণত লোক এটাকে এই অর্থ করে যে মায়ের আনুগত্য করলে স্বর্গ (জান্নাত) পাওয়া যায়। এ কথা সঠিক, কিন্তু এর আসল অর্থ হল,আসলে জাতির মধ্যে জান্নাত তখনই তৈরী হয় যখন মায়েরা সদাচারী হয় আর সন্তানদের সঠিক প্রশিক্ষণ দিতে পারে। যদি মায়েরা খারাপ হয় তাহলে সন্তানরা কখনো ভালো হবে না আর যে জাতিতে সন্তানরা ভালো হয় না সেই জাতিতে জান্নাত তৈরী হতে পারে না।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বর্ণনা করেন-

"অতএব সন্তানদের প্রশিক্ষণ চিন্তার সহিত করতে হবে আর তাদেরকে সঠিক দিক নির্দেশনা দিতে হবে। নারীদেরকে সর্বদা নিজের বাড়িতে সময় দিতে হবে। প্রয়োজন ছাড়া যতদিন সন্তানদের প্রশিক্ষণের বয়স থাকবে মায়েদের চাকরি করার দরকার নেই। করতে হলে তা পরে করবে। কিছু মা এমন আছেন যারা সন্তানের জন্য কুরবানি করে থাকেন অথচ তাঁদের মধ্যে কেউ প্রফেসর, ডাক্তার ও শিক্ষিত- তথাপি সন্তানের তরবিয়তের জন্য তাঁরা বাড়িতে থাকেন, আর সন্তান যখন ঐ বয়সে পৌঁছে যায় যখন মাকে সব সময় দরকার পড়ে না আর সন্তানের সঠিক প্রশিক্ষণ হয়ে যায় তখন মা অন্যান্য কাজ করে। তাই যেভাবেই হোক এর জন্য নারীদের আত্মত্যাগ করতে হবে। আল্লাহ্

তাআলা নারীদের যে সম্মান দান করেছেন যার জন্য তাদের পায়ের তলায় জান্নাত রাখা হয়েছে, তা এই জন্য যে মায়েরা আত্মত্যাগ করে। নারীদের মধ্যে আত্মত্যাগ করার ক্ষমতা অনেক বেশী থাকে। যে নারীরা নিজের ইচ্ছাকে কুরবানী করে তার পায়ের তলায় জান্নাত থাকে।" (আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল ১৫ মে ২০১৫)

হযরত খলিফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) ২০০৪ সালে নাইজেরিয়ার সালানা জলসাতে প্রদত্ত বক্তৃতায় আহমদী নারীদেরকে সম্বোধন করে বলেন:-

"নারীরা মনে রাখবেন যে, ইসলামের সমাজে আপনাদের উচ্চ মর্যাদা রয়েছে। আপনারা যদি আপনাদের এই উচ্চ মর্যাদাকে চিনতে না পারেন তাহলে কোন নিশ্চয়তা দেওয়া যাবে না যে আপনাদের প্রজন্ম ঈমানের (বিশ্বাসের) উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। আপনারা নিজেদের এই মর্যাদাকে চিনুন, যে মর্যাদা সমাজে রয়েছে, নয়তো আপনারা স্বামী এবং সন্তানদের অবাধ্য বলে বিবেচিত হবেন, এবং তাদের অধিকার আদায়কারী বলে গন্য হবেন না। আর সব থেকে বড় বিষয় হল, এমনটা হলে তারা তাদের সৃষ্টিকর্তার অবাধ্যতা করে চলেছে বলে গন্য হবে। অতএব অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে প্রত্যেক আহমদী নারী যেন নিজেকে সংশোধন করার প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখে আর সর্বদা এই দোয়া করতে থাকে যে আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে যেন সঠিক পথে পরিচালনা করে আর তাদেরকে যেন এর উপযুক্ত করে যে তারা তাদের প্রজন্মকে ইসলামি শিক্ষা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ দান করতে পারে।"

আমি সন্তান লালন পালনের ক্ষেত্রে একজন মায়ের দায়িত্বের কিছু দিক তুলে ধরছি যা আমার বক্তব্যের অংশ।

ঐশী প্রেম

সন্তান লালন-পালনের জন্য সর্বপ্রথম ঐশী প্রেম ও তার সঙ্গে পূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করা আবশ্যক। অর্থাৎ একজন মায়ের জন্য আবশ্যক যে জন্মের উদ্দেশ্য উপলব্ধি করে খোদাতাআলার সামনে নতজানু হয়ে নিজ সন্তানদেরকে লালন-পালন করতে পারা, তার জন্য দোয়া করা। শিশুকাল থেকে বাচ্চাদের মনে ঐশী প্রেম জাগাতে হবে।

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন যে, বাচ্চাদেরকে সর্বপ্রথমে যে কথা শেখাতে হবে তা হল **লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্** (আল্লাহ্ ব্যাতীত কোন উপাস্য নেই)। সর্বপ্রথম পাঠ যেটি বাচ্চাদের কানে দিতে হবে তা হল খোদাতাআলার মহিমা ও গৌরব সম্পর্কে। সদ্যজাত শিশুদের প্রশিক্ষণের প্রতি এত বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন যে আঁ হযরত (সা.) শিশুদের কানে সর্বপ্রথমে আযান দেওয়ার নির্দেশ প্রদান করেছেন। যেমন যেমন বাচ্চারা বড় হতে থাকবে মায়েদের কর্তব্য হবে, সুযোগ অনুসারে বাচ্চাদেরকে আল্লাহ্তাআলার নিয়ামত, আশীর্বাদ এবং অনুগ্রহরাজি সম্পর্কে অবগত করিয়ে তাঁর কৃতজ্ঞতাকারী বানানো এবং এই ব্যাপারে বাচ্চাদের অন্তরে ঐশী প্রেম তৈরী করতে হবে। যেমন খাওয়া দাওয়ার সময় বাচ্চাদের বোঝাও যে, এই খাদ্য আল্লাহ্তাআলা আমাদের জন্য দিয়েছেন, যেটি অনেক পরিশ্রমের পরে আমাদের কাছে পৌঁছেছে, সেই জন্য আমাদেরকে আল্লাহ্ তাআলার কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা উচিত। একইভাবে শোওয়ার সময় চাঁদ, তারা ও আকাশ সম্পর্কে এবং দিনের বেলায় অন্যান্য দৃষ্টান্তগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার মাধ্যমে আপনি তাকে সর্বশক্তিমান খোদাতাআলার প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করতে পারেন। আমাদের প্রিয় ইমাম হযরত খলিফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) বলেন:

"বাল্যকাল থেকে অন্তরে ঐশী প্রেম তৈরী করতে হবে, যেমন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন এবাদুর রহমান তৈরী করুন,...শৈশব থেকে অন্তরে ঐশী প্রেম জাগ্রত করুন। যখন সামান্য বোধ শক্তি তৈরি হবে, কোন জিনিস দিলে বলে দেবেন যে এই জিনিসটি আল্লাহ্তাআলা তোমাকে দিয়েছেন। কৃতজ্ঞ হওয়ার অভ্যাস তৈরী করুন আর ধীরে ধীরে বোঝান যে কোন জিনিস চাইলে আল্লাহ্র কাছে চাইবে।"

(বক্তৃতা জলসা সালানা বারতানিয়া ২০০৩)

একজন মায়ের দায়িত্বের মধ্যে 'দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বটি' হল বাচ্চাদের অন্তরে নামাজ পড়ার প্রবণতা তৈরী করুন।

আমার প্রিয় বোনেরা ঃ- সত্যি কথা হল যে তরবিয়ত ব্যক্তিগত আমল দ্বারা শুরু হয়। উদাহরণস্বরূপ, যখন আমরা আমাদের ফারায়েয (শরীয়তের অবশ্যকরণীয় বিধানগুলি) নিষ্ঠার সাথে পালন করব এবং নেতিবাচক কোন কিছু থেকে বিরত থাকব, তাহলে আমাদের সন্তানরাও এই রকম করবে। আমরা যদি মসজিদে নামাজ পড়ার জন্য যাই, তবে আমাদের সন্তানরাও আমাদের সঙ্গে দৌড়ে মসজিদে যাবে। যদি মা বাড়িতে নামাজ পড়ে তাহলে ছোট ছোট বাচ্চারাও মায়েদের অনুকরণ করে সেজদা করবে। কিন্তু আমরা যদি নিয়মিত নামাজ না পড়ি আর বাচ্চাদেরকে নামাজ পড়ার কথা বলি এবং আশা করি যে বাচ্চা নামাজি হবে তাহলে এটা নিজের খামখেয়ালিপনা মাত্র।

হযরত খলিফাতুল মসীহ্ রাবে রহমাউল্লাহুতাআলা বলেছেন ঃ-

"নামাজ মানুষের জীবন স্বরূপ। নামাজ না পড়লে খোদার সঙ্গে কোন সম্পর্ক থাকে না। এর অভ্যাস তৈরী করতে হলে বাল্যকাল থেকেই প্রশিক্ষণের প্রয়োজন। হঠাৎ করে এর অভ্যাস তৈরী হয় না। এর উত্তম পদ্ধতি আঁ হযরত (সা.) এই শিখিয়েছেন যে, সাত বছর বয়স থেকে বাচ্চাকে সঙ্গে করে নিয়ে নামাজ পড়ুন। স্নেহ দিয়ে এটি করুন। কোন রকম কঠোরতা করার দরকার নেই। মারার দরকার নেই। এর পরে বাচ্চা দশ বছর পর্যন্ত ভালোবাসার সঙ্গে শিখতে থাকে, তারপরে দশ ও বারো বছরের মাঝে তার উপরে কঠোরতা দেখাও, কেননা এই বয়সটা খেলার বয়স হয়ে থাকে। তাই এ সময় বাচ্চাদের প্রশিক্ষণের জন্য সামান্য শাস্তি দেওয়া ও কঠোরতা দেখানোর প্রয়োজন।" (খুতবা জুমআ ১১ই ফেব্রুয়ারী ২০০০)

হযরত উম্মুল মুমিনিন নুসরাত জাহাঁ বেগম সাহেবা (রা.) নামাজের প্রতি সতর্কতা অবলম্বন করতেন। প্রতিদিন শুধু নামাজ পড়া নয় বরং সঠিক সময়ে সতর্কতার সঙ্গে নামাজ পড়তেন। অন্যদেরকেও নামাজ পড়ার তাকিদ করতেন। তাঁর অভ্যাস এমন ছিল যে নামাজের সময় হলে ওজু করে আজানের অপেক্ষা করতেন, আর আজানের পরে নিজের আশে পাশের বাচ্চাদেরকে বলতেন যে আমি নামাজ পড়ছি, মেয়েরা তোমরাও নামাজ পড়।

এইভাবে নিজের ব্যক্তিগত আদর্শ দ্বারা উপদেশ দিতেন যা ছিল উপদেশ দেবার সব থেকে উত্তম পন্থা। পিতা-মাতার একান্ত কর্তব্য যে নিজ সন্তানদেরকে বাল্যকালেই নামাজের অর্থ শিখিয়ে দেওয়া। হযরত হযরত খলিফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহ.) বলেছেন,

".....ইবাদতের সম্পর্ক প্রেমের সহিত আর শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিকভাবে অনুবাদ শেখালে কারোর ইবাদত হবে না, ঐসব পিতা-মাতা যাদের অন্তরে ইবাদত লেগে থাকে, যাদের নামাজের সাথে প্রেম থাকে যখন তারা বাচ্চাদের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্কের সহিত অনুবাদ শেখায়, শিশুরা পিতামাতার চোখে চোখ রেখে তাকায় আর তাদের হৃদয়ের উষ্ণতা অনুভব করে, তাদের আবেগ বাচ্চার মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে একটি উত্তেজনা তৈরী করে, তখন তারা নামাজ শেখালে তাদের নামাজ শেখানোর পদ্ধতি একটি ভিন্নমাত্রা যোগ করে।.... প্রত্যেক আহমদীকে নামাজের ব্যাপারে অগ্রসর হতে হবে। পরিশ্রম করতে হবে। এ প্রচেষ্টায় নিজেকে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। নিজের সমগ্র সত্তাকে এতে বিলীন করতে হবে, তবেই সেই প্রজন্মের জন্ম হবে যারা খোদার দৃষ্টিতে নামাজ আদায়কারী প্রজন্ম বলে আখ্যায়িত হবে।....."

(খুতবা জুমআ ৮ই নভেম্বর ১৯৮৫)

কুরআন তেলাওয়াত

একইভাবে সন্তান লালন-পালনের জন্য আরেকটি দিক হল নিয়মিত কুরআন পাঠ করা: প্রতিদিন সকালে প্রত্যেক আহমদীর বাড়ি থেকে কুরআন তেলাওয়াত করার আওয়াজ আসতে হবে। আল্লাহ্তাআলা কেবল কুরআন পাঠ করারই নির্দেশ দেননি বরং কুরআন পাঠ করার উত্তম সময়ের কথাও বলে দিয়েছেন। মহান আল্লাহ্তাআলা বলেন,-

ইন্না কুরআনাল ফাজরি কানা মাশহুদা (সূরা বনি ইস্রাইল, আয়াতঃ ৭৯)

নিশ্চয় প্রভাতে কুরআন পাঠ এমন একটি বিষয় যে, এ সম্পর্কে সাক্ষ্য দেওয়া হয়।

হযরত খলিফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহ.) বলেছেন,

"আমাদের প্রজন্মকে একমাত্র কুরআন করিমই বাঁচাতে পারবে। কুরআন করিম তেলাওয়াত করার অভ্যাস করা আর এর অর্থের উপর চিন্তা-ভাবনা করা আমাদের প্রশিক্ষণের মৌলিক প্রয়োজন এবং তরবিয়তের চাবিকাঠি। এমন কোন শিশু যেন না থাকে যার তেলাওয়াত করার অভ্যাস নেই, তাকে বলো তুমি নাশতা ছেড়ে দাও কিন্তু স্কুলে যাবার পূর্বে তেলাওয়াত অবশ্যই কর। আর তেলাওয়াত করার সময় কিছু অংশ অনুবাদও অবশ্যই পাঠ করো। শুধু তেলাওয়াত করবে না।" (খুতবা জুমআ ৭ই জুলাই ১৯৯৭)

হযরত খলিফাতুল মসীহ আল্ খামেস (আই.) বলেন :-

"একইভাবে আমি আহমদী মা ও কন্যাদেরকে এটি বলতে চাই যে, তোমরা যখন নামাজের প্রতি মনোযোগ দাও, তখন পবিত্র কুরআন করিম তেলাওয়াত ও এটি বোঝার প্রতি মনোযোগ দাও। এটি তোমাদেরকে আল্লাহ্তাআলার আদেশ সম্পর্কে অবগত করবে, আর এর মাধ্যমে তোমরা তোমাদের সন্তানদের সঠিক প্রশিক্ষণ দেবার উপায় পাবে। কেননা কুরআন করিম তেলাওয়াত আর এর অনুবাদ পাঠের মাধ্যমে মহান আল্লাহ্ তাআলার আদেশসমূহ সম্পর্কে অবগত হওয়া একান্ত প্রয়োজন।"

(জলসা সালানা মরিসাস ২০০৫, আল-আযহার প্রথম খন্ড, তৃতীয় অংশ পৃষ্ঠা ৩৫৪-৩৫৫)

তাই নিয়মিত পবিত্র কুরআন করিম তেলাওয়াত করা আমাদের মায়েদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। এর অর্থ ও তাৎপর্যকে জানুন, বুঝুন, এর উপর আমল করুন। আপন সন্তানদেরও এতে ন্যায়নিষ্ঠ হয়ে ওঠার অভ্যাস তৈরী করুন। আল্লাহ্ তৌফিক দান করুন।

খিলাফতের প্রতি ভালবাসা

তরবিয়তের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল আমাদের এবং আমাদের সন্তানদের মাঝে খিলাফতের প্রতি ভালবাসার মনোভাব তৈরী করা। আজ পৃথিবীতে বসবাসকারী সমস্ত মানুষের মধ্যে একমাত্র আহমদীয়া জামাতই খিলাফত ব্যবস্থার সহিত যুক্ত থেকে শান্তির নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্যে রয়েছে, আর তার আশির্বাদ ও অনুগ্রহরাজি থেকে কল্যানমন্ডিত হয়ে উঠছে। যদি এই কল্যাণরাজি আমরা আমাদের প্রজন্মের মধ্যেও সঞ্চারিত রাখতে চাই তাহলে আমাদের উপরে এই মহান দায়িত্ব ও কর্তব্য বর্তায় যে, আমরা যেন সম্পূর্ণ আন্তরিকতা এবং বিশ্বস্ততার সহিত যুগ খলিফার আনুগত্যকারী হই। আর আমাদের ওঠা, বসা, শয়ন-স্বপন সব কিছুই যুগ ইমামের ইশারায় হওয়া উচিত। এটাই খলিফার নৈকট্য পাওয়া আর তাঁর থেকে কল্যাণ অর্জনের একমাত্র উপায়। এর জন্য আমাদের করণীয় হল যে, নিয়মিতভাবে হুযুর আনোয়ার (আই.) এর সমস্ত খুতবা ও অনুষ্ঠান শোনা আর নিয়মিত হুজুর আনোয়ার (আই.) এর নিকট দোওয়ার জন্য পত্র প্রেরণ করা। বাচ্চাদের মধ্যেও এই অভ্যাস তৈরী করতে হবে এবং তাদেরকে উপদেশ দিতে হবে যে, কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেবার আগে প্রথমে প্রিয় যুগ ইমামের নিকট হতে অবশ্যই দিক

নির্দেশনা নিতে হবে, এছাড়া যুগ খলিফার সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা ও চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া আর যদি দেখা করার সুযোগ পাও তবে এটিকে অগ্রাধিকার দেবে, আর বাচ্চাদেরকে এম.টি.এ এর সঙ্গে সংযুক্ত রাখবেন। তাদের সঙ্গে নিজেও বসে অনুষ্ঠান দেখুন। আপনার এবং আপনার সন্তানদের মধ্যে বিশেষ করে হুজুর আনোয়ার (আই.) এর জন্য দোওয়া করার অভ্যাস কৈরী করুন। এটি হুজুর আনোয়ারের প্রতি ভালবাসা এবং আনুগত্যের বন্ধনকে আরও শক্তিশালী করবে। ইনশাআল্লাহ।

হুজুর আনোয়ার ২০০৫ সালের তানজানিয়ার বার্ষিক জলসাতে এক বক্তৃতায় খিলাফতের সহিত প্রেম সম্পর্কে বলেন,

"উগান্ডায় যখন আমরা নেমে গাড়ি থেকে বের হলাম তখন এক মহিলা তার দুই -আড়াই বছর বয়সী শিশুকে কোলে নিয়ে ছুটছিল। তার দুচোখের মধ্যে খিলাফত ও জামাতের সহিত তার নিবিড় সম্পর্কের প্রতিচ্ছবি দৃশ্যমান হচ্ছিল, আনুগত্যের সম্পর্ক পরিস্ফুট হয়ে চলছিল। কোলের শিশুটি আমার দিকে তাকায়নি, তাই সে বার বার তার মুখ আমার দিকে করে দিচ্ছিল, এভাবে অনেক দূর পর্যন্ত সে দৌড়তে থাকে। সেখানে এত ভিড় ছিল যে তার ধাক্কাও লাগছিল কিন্তু সে কোন ভ্রুক্ষেপ করল না। অবশেষে শিশুটির চোখ আমার দিকে পড়লে শিশুটি হেসে হাত নাড়ায়। এবার ঐ মা স্বস্তি পেল। অপরদিকে শিশুটির মুখও এমন উজ্জ্বল ও হাসিখুশি ছিল, যেন সে আমাকে অনেক বছর ধরে চেনে। তাই যতদিন এমন মায়েরা জন্মাতে থাকবেন যাদের কোলে খিলাফতকে ভালবাসার মতো সন্তানেরা বেড়ে উঠবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আহমদীয়া খিলাফতের কোন বিপদ হবে না।"

উত্তম চরিত্র

সন্তান লালন-পালনের ক্ষেত্রেও মায়েদের দায়িত্ব এটা যে, তারা তাদের সন্তানদের উচ্চ নৈতিকতার পরিচয়ের দ্বারা বড় করে তোলেন। মিথ্যা বলা থেকে এড়িয়ে চলুন বরং মিথ্যার প্রতি ঘৃণা থাকতে হবে। মৌখিক পরামর্শই যথেষ্ট নয় বরং নিজে সত্য বলার অভ্যাস করুন। এমনকি খেলা বা কৌতুকের মধ্যেও মিথ্যা বলবেন না। সন্তানদের মধ্যে নম্রতা থাকতে হবে। পরস্পরকে ভালবাসা, উত্তম আচরণ করা, ভদ্র ও শালীন ভাষা ব্যবহার করা, ধৈর্য্য ধারণের ক্ষমতা ও আনুগত্য প্রর্দশন করা, বলিষ্ট ও সাহসী হওয়া, দরিদ্রদের প্রতি সহানুভূতি ও দুঃখ-কষ্ট দূর করার অভ্যাস থাকা, বড়দের প্রতি সম্মান ও আনুগত্য প্রদর্শন -এই সমস্ত নৈতিক গুণাগুণ বাল্যকাল থেকেই প্রচেষ্টার মাধ্যমে তৈরী হয়। আর এগুলি পরিবার থেকেই শুরু হওয়া উচিত। কেননা বেশির ভাগ লোক পিতা-মাতার দ্বারা নষ্ট হয়ে যায়। খারাপ চরিত্র মহাপাপ হয়ে দাঁড়ায়, কারণ খারাপ লোকের জন্য জান্নাত অকল্পনীয় একটি বিষয়।

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) বলেন- "পিতা-মাতা যতই চেষ্টা করুক না কেন মন্দ নৈতিকতার কু প্রভাব থেকে সন্তানকে রক্ষা করার, যতক্ষণ না পর্যন্ত শিশুর সঙ্গী- সাথী ও মজলিশ ভালো না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত পিতা মাতার প্রচেষ্টা সন্তানদের নৈতিকতা সংশোধনে কার্যকরী ও উপযোগী হবে না। অবশ্যই একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তাদের ভাল তরবিয়ত সন্তানদের মধ্যে ভাল চিন্তার জন্ম দেয়, কিন্তু যদি উত্তম তরবিয়তের পাশাপাশি সন্তানের ওঠাবসা যদি ভাল না হয় তবে অসৎ সঙ্গের মন্দ প্রভাব তরবিয়তের প্রভাবকে এতটাই দুর্বল করে দেয় যে ঐ তরবিয়ত হওয়া না হওয়া সমান হয়ে যায়। বাল্যকালের অসৎ সঙ্গীর সাথে মেলামেশার জন্য শিশুর মধ্যে এমন বদঅভ্যাস জন্মায় যে পরবর্তী বয়সে এর প্রতিকার করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।" (আল আযহার প্রথম খন্ড পৃষ্ঠা ১৬০-১৬১)

তাই আমাদের মায়েদের কর্তব্য হল নিজেদের ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত তুলে ধরার পাশাপাশি আমাদের সন্তানদেরও যেন খেয়াল রাখি যে তারা অসৎ সঙ্গীর সাথে যেন না মেশে বা কোন খারাপ অনুষ্ঠান যেন না দেখে। হযরত খলিফাতুল মসীহ খামেস (আই.) বলেন,

"সুতরাং যদি আহমদী সন্তানদের মায়েরা তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হন, আজ আপনি যদি আপনার দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেন, আপনার কথা এবং কাজের মধ্যে কোন তফাৎ যদি না থাকে, আপনি যা বলছেন তা সত্য এবং সত্যের উপর ভিত্তি করে হয়, তাহলে আহমদীয়া জামাতের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক স্থাপনকারী প্রজন্ম থাকবে। ইনশাআল্লাহ্‌। তাই এই মর্যাদাটি আপনার অন্তরে সর্বদা স্মরণ রাখুন এবং আল্লাহ্‌র ইবাদত ও ব্যবহারিক উদাহরণে উচ্চ মান অর্জনের চেষ্টা করুন। পবিত্র কুরআনের সকল নির্দেশ মেনে চলার চেষ্টা করতে থাকুন। আল্লাহ্‌তাআলা আমাদের যে সকল উচ্চ নৈতিকতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তা অর্জন করার চেষ্টা করুন। সর্বদা ভালো কাজ করার পাশাপাশি সৎ কাজের উপদেশ দিতে থাকুন। মন্দকে পরিত্যাগ করুন এবং আপনার পরিবেশে মন্দের প্রতিবন্ধক হোন। সমাজেও মন্দকে ছড়িয়ে পড়তে দেবেন না। একে অপরের প্রতি সদয় হোন। আপনার ক্ষোভ ও আপনার রাগ ভুলে যান। সাধারণত দেখা যায় যে নারীরা তাদের মনের মধ্যে ক্ষোভ দীর্ঘদিন ধরে রাখে। যদি আপনার হৃদয়ে বিদ্বেষ ও ঘৃণা থাকে তাহলে এমন হৃদয়ে সর্বশক্তিমান আল্লাহ অবতরণ করেন না। এই ধরনের হৃদয়ের ইবাদতের মান তাই হয় না যা সর্বশক্তিমান খোদা চান।" (জলসা সালানা অষ্ট্রেলিয়া ২০০৬ মহিলাদের উদ্দেশ্যে খেতাব মতবুয়া আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল ১২ই জুন ২০১৫)

তাই আমার প্রিয় বোনেরা! আমাদের সকলকে নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়ে এবং দোওয়ার সহিত আমাদের সমস্ত শক্তি ও ক্ষমতা দিয়ে তরবিয়তে মনোনিবেশ করতে হবে। সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ্‌ রাবে (রা.) বলেন,

"আপনি যদি আজ মা হয়ে থাকেন তাহলে আজও মহান আল্লাহ্‌ আপনাকে এই ক্ষমতা দিয়েছেন যে নিজের আশেপাশে এবং পরিবেশকে খোদার ভালোবাসার রং-এ পূর্ণ করা চেষ্টা করুন। আর আপনি যদি মা না হন তাহলে আজ সেই পবিত্র পরিবর্তনগুলি তৈরী করুন, তাহলে যখন আপনি মা হবেন তার পূর্বেই আপনি যেন একজন খোদাপ্রেমী সত্ত্বা হয়ে গিয়ে থাকেন। ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা যাদের আপনি দুধ পান করান বা যারা আপনার হাতে দুধ পান করে বড় হয়, ঐ সময়ে তাদেরকে ঐশী প্রেমের গীত শোনান। তাদের সঙ্গে ঐশী প্রেমের কথা বলুন, তাহলে সমস্ত যাত্রা সহজ হয়ে যাবে। .....আপনার পরিবর্তন ছাড়া আপনার সন্তানদের পরিবর্তন হবে না। যতক্ষণ না আপনার আত্মা ঐশী আলোয় পূর্ণ হয়, আপনার সন্তানরা ঐশী আলোয় পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে না। .....দেখুন আপনি একটি নতুন শতাব্দীর শিরোভাগে দাঁড়িয়ে আছেন। আপনাকে এই শতাব্দীর মুজাদ্দিদ বানানো হয়েছে। একটি প্রজন্মের খলিফা নিযুক্ত করা হয়েছে আপনাকে। যাতে আপনি আপনার ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উত্তম তরবিয়তের চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হন। এটি এমন একটি পন্থা যার মাধ্যমে আপনি ভবিষ্যতে আপনার সন্তাদের প্রশিক্ষণ দিতে পারবেন। আল্লাহ্‌তাআলা আপনাকে এর তৌফিক দান করুন। "

(মহিলাদের উদ্দেশ্যে ব্রিটেনে বার্ষিক জলসার ভাষণ ২৭শে জুলাই ১৯৯১)

পরিশেষে আমি আমার প্রিয় ইমাম হযরত খলিফাতুল মসীহ্‌ আল খামেস (আই.) এর একটি উদ্ধৃতি পড়ে আমার বক্তৃতা শেষ করব। তিনি বলেন,

" সুতরাং হে আহমদী সৌভাগ্যবতী মায়েরা, যারা মহানবী (সা.) এর নির্দেশে সাড়া দিয়ে এই যুগের ইমামকে চিনতে পেরে তাঁর আনুগত্যের জোয়াল নিজেদের ঘাড়ে চাপিয়ে নিয়েছ, দুনিয়ার বিরোধীতা মেনে নিয়েছ এবং শপথ করেছ যে আমরা সর্বদা ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দেব। আপনারা নিজেরা মূল্যায়ন করুন এবং দেখুন, আমরা এই অঙ্গীকার থেকে দূরে যাচ্ছি না তো। আমাদের ধর্মকে বিশ্বের সামনে প্রাধান্য দেওয়া এখন কেবল নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে যায়নি তো? আমরা কি এটাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি? আমরা কি এই অঙ্গীকারটি পরবর্তী প্রজন্মের কাছে হস্তান্তর করেছি? আমাদের কোলে যারা লালিত পালিত হচ্ছে তাদেরকে কি আমরা ইবাদুর রহমান এবং নেক দলের অন্তর্ভূক্ত বলার অধিকার রাখতে পারি? এটি কি সেই আমানত যে আমানত আল্লাহ্‌তাআলা আমাদেরকে দান করেছিলেন, সেই আমানত যে আমানত আল্লাহ্‌তাআলা আমাদের গর্ভ থেকে জন্ম দিয়েছেন, যাদেরকে আমরা মহানবী (সা.) এর উম্মতে অন্তর্ভূক্ত করতে আল্লাহ্‌র নিকট উপহার হিসাবে পেশ করতে পারি? যাদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়েছি, আমরা এবং আমাদের সন্তানরা কি উত্তম উম্মত বলার যোগ্য? উত্তর যদি 'হ্যাঁ' হয় তাহলে মুবারক। আর যদি না হয়, তাহলে আপনাকে এই সব অর্জন করতে হলে নিজেকে সংশোধন করতে হবে। যেখানে প্রয়োজন সেখানে স্বামীদের ধর্মের দিকে ঝুঁকানোর চেষ্টা করতে হবে। আমাদের বাড়ির পরিবেশকেও এমন পবিত্র করতে হবে যেখানে স্বামী স্ত্রীর পরিবেশ একটি পুণ্যময় ও পবিত্র পরিবেশ তৈরী হবে, এবং এইভাবে প্রতিটি আহমদী পরিবারকে একটি পাক ও পবিত্র সমাজে পরিণত করতে হবে। সেখানে যে সন্তানের জন্ম হয় যে যেন বড় হয়ে ধার্মিকদের অন্তর্ভূক্ত হয়। তাই আপনার মান ও মর্যাদা জানুন। কোন আহমদী নারী সমাজের সাধারণ নারীর মতো নয়। আপনারা হলেন সেই সব মায়েরা যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) এই সুসংবাদ দিয়েছেন যে জান্নাত আপনাদের পদতলে বিরাজ করছে, এবং কোন মা চায় না যে, তার সন্তানরা দুনিয়া ও আখেরাতে জান্নাতের উত্তরাধিকারী হওয়া থেকে বঞ্চিত হোক। তাই একটি নতুন সংকল্প নিয়ে সাহস ও দোয়ার মাধ্যমে নিজ সন্তানের তরবিয়তের দিকে মনোনিবেশ করুন। আপনারা ভাগ্যবান যে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) ও মসীহ্‌ পাক (আ.) এর দোওয়া আপনাদের সঙ্গে আছে। হে আল্লাহ্‌ তুমি আমাদের সাহায্য কর আর আমাদের প্রজন্মকে ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখো। আল্লাহ্‌তাআলা আপনাদের সকলকে আপন সন্তানদের সঠিকভাবে তরবিয়তের হক আদায় করার তৌফিক দান করুন।

(আল ফযল ইন্টান্যাশনাল ২৯ আগষ্ট থেকে ৪ঠা সেপ্টেম্বর ২০০৩)

সব শেষে আমরা দোওয়া করি যে সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌রই যিনি জগতসমূহের প্রভু প্রতিপালক।

মহানবী (সা.)-এর বাণী

اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

কর্ম নির্ভরশীল উদ্দেশ্য তথা সংকল্পের উপর।

দোয়াপ্রার্থী: **Ayesha Begum, Harhari, Murshidabad**

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

দোয়ার জন্য হৃদয় যখন বেদনায় পূর্ণ হয়ে যায় এবং সকল আবরণকে বিদীর্ণ করে ফেলে, সেই সময় বুঝে যাওয়া উচিত যে দোয়া কবুল হয়েছে। এটি মহান নাম। **(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১০০)**

দোয়াপ্রার্থী: **Pervez Hossain Sb, Bolpur, Birbhum**

খিলাফত– নিরাপত্তার দূর্গ

মূল–কে তারিক আহমদ, সদর মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়া ভারত ও ইনচার্জ নুরুল ইসলাম বিভাগ, কাদিয়ান। ভাষান্তর: জাহিরুল হাসান কাদিয়ান, মুবাল্লিগ সিলসিলা।

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

(সূরা বাকারা আয়াত ৩১)

অনুবাদঃ আর যখন তোমার প্রভু ফেরেশতাদের বললেন, 'আমি পৃথিবীতে একজন খলীফা নিযুক্ত করতে চলেছি, তখন তারা বলল, 'তুমি কি সেখানে এমন কাউকে নিযুক্ত করবে যে তাতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে এবং রক্তপাত করবে? অথচ আমরাই তোমার প্রশংসা সহ তোমার মহিমা কীর্তন করি এবং তোমার পবিত্রতার প্রশংসা করি।' তিনি উত্তর দিলেন: 'আমি যা জানি তোমরা তা জানো না।'

নিষ্কলুষ হৃদয়ে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে আমার দিকে প্রত্যাবর্তন কর এতেই সকল কল্যান নিহিত, চারিদিকে হিংস্র শ্বাপদসংকুলের আনাগোনা, একমাত্র আমিই হলাম নিরাপত্তার বেষ্টনী।

সুধী!

হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালাম বর্ণনা করেছেন:"এ যুগের দুর্ভেদ্য দুর্গ আমি। যে ব্যক্তি আমাতে প্রবেশ করে সে চোর, দস্যু ও হিংস্র জন্তু থেকে নিজ প্রাণ রক্ষা করে। কিন্তু যে ব্যক্তি আমার গৃহসীমা থেকে দূরে থাকতে চায়, তার চারদিকে মৃত্যু বিরাজমান এবং তার শবদেহও নিরাপদ নয়।"

(ফতেহ ইসলাম পৃঃ ৩৪)

সম্মানীয় সভার সভাপতি এবং সুধী দর্শকমন্ডলী!

আমার বক্তৃতার বিষয় হল, 'খিলাফত-প্রশান্তি ও নিরাপত্তার বেষ্টনী'

সুধী! হযরত আদম (আ.)-এর খিলাফতের প্রারম্ভকালেই প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ তাআলা এবং ফেরেশতার মধ্যে হওয়া এই কথোপকথন একটি বিষয়কে সুস্পষ্ট করে যে, যুগ খলীফার শান্তি প্রদায়ী আবির্ভাবের সাথে সাথে অনাচার এবং নৈরাজ্যের বাদল দেখা যায়, যার অন্তর্হিত তাৎপর্য ফেরেশতাও বুঝতে অক্ষম যে এই অপ্রতিরোধ্য তুফানের আসল কারণ কি? এবং এর থেকে পরিত্রাতাই বা কে, যে এই অত্যাচার- অনাচারের হাত থেকে এ ধরাপৃষ্ঠকে পবিত্র করবে? ফেরেশতাদের নিশ্চুপ করার জন্য আল্লাহ্ তাআলার সংক্ষিপ্ত উত্তর ছিল, ইন্নি আ'লামু মা লা তা'লামু অর্থাৎ নিশ্চিত আমি যা জানি তোমরা তা জানো না।

পৃথিবীর ইতিহাস এ সাক্ষ্য দিচ্ছে যে ঐশী বিধান **'খিলাফত - নিরাপত্তার বেষ্টনী'** এই বিষয়টিকে আপন মহিমার অনন্য সাধারণ প্রকাশের মাধ্যমে এমন সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করেছে যে মানবশ্রেণী থেকে শুরু করে জিন্ন এবং ফেরেশতাদেরকে অবধি নিজেদের বোধশক্তির অপরিশীলতা স্বীকার করে তাদেরকে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তাআলার দররবারে সেজদাবনত হতে হয়েছে।

বিষয়টি কোন উপাখ্যানমূলক নয়। বরং এটি এমন একটি অবিচ্ছিন্ন নদীর ন্যায় যার কোন কুল- কিনারা নেই। আল্লাহ্ তাআলার অশেষ করুনা যে আমরাই সেই সৌভাগ্যবান জামাত যারা 'খিলাফতের আশিষ ও কল্যাণরাজি এবং এর নিরাপত্তার বেষ্টনী' রূপের ঈমান বর্ধক দৃশ্যাবলীর প্রত্যক্ষদর্শী। প্রতিটা মুহূর্তে এর নিদর্শনাবলী আমাদের সামনে প্রকাশিত হচ্ছে।

খিলাফতের ব্যবস্থাপনা খুবই কল্যানময় একটি ঐশী ব্যবস্থাপনা। যার মাধ্যমে নবুওতের রবির বাহ্যিক অস্তাচলে যাওয়ার পর আল্লাহ্ তাআলা নবুওতের শশীকে অভ্যুদয়ের ব্যবস্থা করে দেন। আর এরকম জামাতকে সেই কঠিন পরিস্থিতির প্রভাবমুক্ত করেন, যা কোন নবীর তিরোধানের পর নবদিক্ষীত জামাতের উপর একটি গুরুতর সমস্যারূপে প্রতীয়মান হয়ে থাকে।

খিলাফতের ব্যবস্থাপনা হল সেই কল্যাণময় আসমানী ব্যবস্থাপনার নাম যা আল্লাহ্ তাআলা মোমেনদেরকে তাদের আধ্যাত্মিক স্থায়িত্ব এবং অগ্রগতির নিমিত্তে দান করেছেন। এটি একটি মহান পুরস্কার, যা ঈমান এবং পূন্যকর্মের মৌলিক শর্তগুলির সাথে শর্তযুক্ত। এই ঐশী দানশীলতা আসলে হাবলুল্লাহ্ (অর্থাৎ আল্লাহর রজ্জু)-ই নামান্তর। এই ঐশী রজ্জুকে দৃঢ়তার সাথে আঁকড়ে ধরাই হল মোমেনদের জামাতের জন্য তাদের ঈমানের সত্যায়নও, আবার অন্যদিকে তাদের শান্তি, নিরাপত্তা এবং ঐশী উন্নতি সাধনের নিশ্চয়তাও।

সুধী! আজ আমরা প্রত্যক্ষ করি যে বিশ্বে ভয়াবহ অস্থিরতা ও বিপদ ঘনিয়ে রয়েছে। এ যুগের এ হেন সংকটময় পরিস্থিতির চিত্রাঙ্কণ হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালাম বহু পূর্বেই দ্ব্যার্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছিলেন:

"হে ইউরোপ তুমিও নিরাপদ নও, হে এশিয়া তুমিও নিরাপদ নও। হে দ্বীপবাসীরা তোমাদের কোন কল্পিত খোদা তোমাদের সাহায্য করবে না। আমি শহরগুলোকে ধ্বংস হতে দেখছি! আমি জনপদগুলোকে জনমানবশূন্য দেখছি। এক-অদ্বিতীয় খোদা দীর্ঘদিন যাবৎ চুপ ছিলেন। তাঁর চোখের সামনে বহু অন্যায় সংঘটিত হয়েছে। তিনি চুপ থেকেছেন। কিন্তু এখন তিনি তাঁর রূদ্রমূর্তি প্রদর্শন করবেন। যার কান আছে সে শুনে রাখুক, ঐ সময় দূরে নয়- আমি চেষ্টা করেছি সবাইকে আল্লাহ্‌র নিরাপদ আশ্রয়ে একত্র করার। কিন্তু আল্লাহ্‌র তকদীরের লিখন পূর্ণ হওয়া একান্ত আবশ্যক ছিল। আমি সত্য সত্যই বলছি এদেশের পালাও ঘনিয়ে আসছে। নূহ (আ.)-এর যুগের ছবি তোমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠবে। লুত (আ.)-এর ভূমির ঘটনা তোমরা নিজেরা প্রত্যক্ষ করবে। কিন্তু আল্লাহ শান্তি প্রদানে ধীর। তওবা কর যেন তোমাদের প্রতি করুণা প্রদর্শিত হয়। যে খোদাকে পরিত্যাগ করে সে মানুষ নয়, কীট। আর যে তাঁকে ভয় করে না, সে জীবিত নয়, মৃত।"

(হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন ২২তম খন্ড, পৃঃ ২৬৮-২৬৯)।

আজ মানবজাতির অবস্থা وكنتم على شفا حفرة من النار অর্থাৎ অগ্নিকুন্ডের কিনারায় দন্ডায়মান দিক্‌ভ্রান্তের ন্যায়। আজ এ বিশ্ব একটি প্রলয়ঙ্কারী বিপদের দ্বারপ্রান্তে অবস্থান করছে। পৃথিবীতে একটি অস্থিরতা এবং ভীতির বাতাবরণ বিরাজমান। যুদ্ধের আবহ সৃষ্টি হয়েছে। এমতবস্থায় মানবজাতির জন্য তাদের জাগতিক প্রয়োজনীয়তার চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি তাদের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার বিষয়টি আজকাল যেভাবে জনমানসে উঠে আসছে তা ইতিপূর্বে কখনও আসেনি। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের একটা আতঙ্ক তৈরী হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে মানবজাতির প্রতি পূর্ণ সহানুভূতিশীল, তাদের নিরলস সেবা প্রদান এবং তাদের মঙ্গলকামনায় প্রার্থনাকারী একমাত্র এই পবিত্র ঐশী ব্যবস্থাপনা খিলাফত আহমদীয়াই বিদ্যমান। আজ বিশ্বব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠায় যে প্রচেষ্টা খিলাফত আহমদীয়া করে যাচ্ছে তার দৃষ্টান্ত অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। আমাদের প্রাণপ্রিয় ইমাম হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধ সম্পর্কে এ বিশ্বকে দীর্ঘদিন ধরে সতর্ক করে আসছেন। শান্তি, সম্প্রীতি এবং সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠায় সদা নিয়োজিত এই একজনই বিশ্ববরেন্য নেতা এবং পথপ্রদর্শক রয়েছেন আর আমরা অনেক সৌভাগ্যবান যে আমরা তাঁরই মান্যকারী। কিন্তু যারা তাঁকে স্বীকার করেনি, তাদের জন্যও তিনি সমানভাবে বেদনা রাখেন এবং তাদের মঙ্গলকামনায় দোয়াও করে থাকেন। কেননা বর্তমান যুগে একমাত্র খিলাফতে আহমদীয়াই হল শান্তি সুনিশ্চিতকারী একমাত্র ঐশী ব্যবস্থাপনা।

আজ এ বিশ্ব যখন ধর্মহীনতার দিকে মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে, আর মানুষ তাদের প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা থেকে বিমুখ হয়ে পড়েছে, ফলস্বরূপ দিকে দিকে ব্যক্তিগত অথবা জাতীয় স্তরে অনিশ্চয়তা এবং অশান্তির আগ্রাসনের শিকারে পরিণত হয়ে চলেছে- এমতাবস্থায় আমাদের প্রিয় ইমাম পৃথিবীর প্রকৃত শান্তি ও নিরাপত্তা প্রদানকারী অর্থাৎ আল্লাহ্ তাআলাকে শনাক্ত করার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে চলেছেন। হুযুর আনোয়ার বিভিন্ন ফোরামে কুরআন এবং ঐতিহাসিক তথ্য-প্রমান উপস্থাপন করে দেখিয়েছেন যে এ বিশ্বের জন্য প্রকৃত শান্তি এবং দীর্ঘমেয়াদী নিরাপত্তা একমাত্র আল্লাহ্ তাআলাকে জানা, তাঁর অধিকারসমূহকে যথাযথ ভাবে আদায় করা এবং মানুষের প্রাপ্য অধিকার প্রদান করা এবং সাম্য প্রতিষ্ঠার সাথে শর্তযুক্ত। সৈয়্যদনা হুজুর আনোয়ার জলসা সালানা জার্মানী ২০২২ উপলক্ষ্যে প্রদত্ত ভাষনে বলেন:

"পৃথিবীতে প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য এটাই একমাত্র আকীদা পোষণ এবং এর উপর কর্তব্যপরায়ন হতে হবে যে, এ মহাবিশ্বের একজন খোদা রয়েছেন যিনি সবার শান্তি চান। যতক্ষণ না পর্যন্ত একজন মহা অস্তিত্ব বিদ্যমান বলে স্বীকার না করা হয়, এবং তাঁর প্রতি ভালবাসা হৃদয়ে সৃষ্টি না করা হয়, ততক্ষন পর্যন্ত প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠা হতে পারে না। আর এই বিশ্বাস পোষন যে আল্লাহ্ তাআলাই হল প্রকৃত নিরাপত্তা প্রদানকারী, এই শিক্ষা একমাত্র ইসলামই মহানবী (সা.)-এর মাধ্যমে তুলে ধরেছে। শান্তি ততক্ষণ অবধি প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে না যতক্ষণ না পর্যন্ত মানুষের মনে প্রকৃত ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত না হয়। আর প্রকৃত ভ্রাতৃত্ব একমাত্র খোদা তাআলাকে মান্য করা ছাড়া তৈরী হতে পারে না।

সৈয়্যদনা হুযুর আনোয়ার (আই.) বিশ্বের বহু দেশের রাষ্ট্রপতিগণকে শান্তি প্রতিষ্ঠার উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে পত্রের মাধ্যমে তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

২০১২ সালে আমেরিকার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামাকে সম্বোধন করে সৈয়্যদনা হুযুর আনোয়ার বলেন,

"পৃথিবীর এই ক্রমবর্ধমান অস্থিরতা এবং নৈরাজ্যকে প্রত্যক্ষ করে আমার মনে হয়েছে যে আপনাকে আমার পত্র লেখা উচিত। কেননা আপনি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান, আর এটা এমন একটা দেশ যা পারমানবিক শক্তির অধিকারী.....আমার আপনাকে বরং বলা ভাল বিশ্বের সমস্ত রাষ্ট্রনেতার প্রতি এই আহ্বান যে, আপনারা পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠায় আপন আপন ভূমিকা পালন করুন.....আল্লাহ্ তাআলা আপনাকে এবং সকল বিশ্বনেতৃবৃন্দকে আমার এই বার্তা অনুধাবন করার এবং এর উপর যথোচিত আমল করার সৌভাগ্য প্রদান করুন।"

একই ভাবে সৈয়্যদনা হুযুর আনোয়ার কানাডার ওন্টারিওতে ইয়ার্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত তাঁর ভাষনে বলেন,যদি আমরা প্রকৃত অর্থে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চাই তবে আমাদের ন্যায়সঙ্গত কাজ করতে হবে। সাম্য এবং ন্যায়কে আমাদের গুরুত্ব দিতে হবে। মহানবী (সা.) কি সুন্দর বলেছেন, অপরের জন্য তাইই পছন্দ করো যা তুমি নিজের জন্য পছন্দ করে থাকো। আমাদের শুধু নিজেদেরই লাভের কথা ভাবলে চলবে না বরং মুক্তমনা হয়ে এ বিশ্বের সার্বিক কল্যানকার্যে আমাদের নিয়োজিত হতে হবে। এ যুগে প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠার এগুলোই একমাত্র মাধ্যম।"

(২৮ অক্টোবর ২০১৬, ইয়ার্ক বিশ্ববিদ্যালয়, ওন্টারিও, কানাডা)

খিলাফতের অধীনে শান্তির আচ্ছাদনে আসার একটা দৃষ্টান্ত এটাও যে করোনা মহামারী প্রকাশ হওয়ার পর বিশ্বের বিভিন্ন ধর্মীয় সংগঠনগুলি সমাবেশ আকারে যে উপসনা ইবাদাত করেছে তাতে তারা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে বলে মনে হচ্ছিল। মসজিদের বদলে বাড়িতে

পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ এবং জুমআর নামাজ পড়ার বিষয়ে মুসলমানদের মধ্যে বিতর্ক দেখা দিয়েছিল। কোথাও আবার পরিস্থিতি সংঘর্ষের আকার ধারণ করেছিল। কেউ কেউ আবার এতটাই বাড়াবাড়ি করেছিল যে ছাড় থাকা সত্বেও মসজিদে গিয়ে কোনরকম সতর্কতা অবলম্বন ছাড়াই বাজামাত নামাজ আদায় করা জরুরি মনে করেছিল। ফলস্বরূপ তারা ক্ষতির সম্মুখীন হয়। আবার এমনও অনেকে ছিল যারা সতর্কতার নামে নামাজ পড়াই ছেড়ে দিয়েছিল। কিন্তু আহমদীয়া জামাতের ইমাম ২৭ই মার্চ ২০২০ সালে তাঁর অফিস থেকে সম্প্রসারিত একটি বিশেষ বার্তায় বিশ্বব্যাপী আহমদীদেরকে এই সংকটময় পরিস্থিতিতে আপন আপন বাড়িতে নামাজ এবং জুমআ আদায় করতে বিশেষভাবে নির্দেশনা প্রদান করেন। এ কথা শোনার পর যুগ খলীফার হাত ও বাহু জামাতের ব্যবস্থাপনা কাজ শুরু করে এবং সম্ভাব্য সকল উপায়ে আহমদীদেরকে আপন আপন বাড়িতে নামাজ আদায় করার বিষয়ে তাদেরকে অবগত করে। ফলত সকল আহমদী বিনা ব্যতিক্রমে আপন আপন বাড়িতে ইবাদত করতে থাকে। মোটকথা যেখানে যুগের খলীফা না থাকার দরুন অন্যান্যরা বিভিন্ন দ্বিধা দ্বন্দ্বের মধ্যে নিমজ্জিত ছিল সেখানে খিলাফতের কল্যানে কোনরকম ভয়-ভীতি ও সমস্যা ছাড়াই শরীয়তের বিধান প্রতিপালন করা হয়েছিল। আর এমনটা না হওয়ার কোন কারণ তো ছিল না। কারন তিনিই তো ছিলেন **'সুরক্ষার এক মহা বেষ্টনী'**।

অতএব নিযামে খিলাফতের একদিক যদি ঈমানের সুদৃঢ় ভিত্তিপ্রস্তরের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে অপরদিকে এর কল্যানরাজি বিশ্বের প্রভু প্রতিপালক আল্লাহ্‌র আরশকে স্পর্শ করছে। যেখানে আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে ঐশী সাহায্য ও সমর্থন এবং সুরক্ষা ও নিরাপত্তার দৃশ্য প্রতিটা মুহূর্তে দৃশ্যমান হচ্ছে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) এর আন্তরিক দোয়া এবং আশ্বস্ত ও স্বান্তনাদায়ী বাক্যই জামাতের আপামর সদস্যের মানসিক প্রশান্তিদান করে চলেছে। এর ফলে তারা শান্তি ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা লাভ করে থাকে। হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ব্যক্তিগত সেক্রেটারী জনাব মুনির জাভেদ সাহেব বলেন,

৪ই মে ২০০৬ইং বৃহস্পতিবারের দিন ছিল। হুযুর আনোয়ার পূর্ব এশিয়ার একটি দেশ ফিজিতে অবস্থান করছিলেন। তখন রাত প্রায় আড়াইটে হবে, এমন সময় রাবোয়া, লন্ডন এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে ফোন আসা শুরু হয় যে এ সময় টেলিভিশনে যে সংবাদ প্রদর্শিত হচ্ছে সে অনুযায়ী একটি বিশাল সুনামী ফিজির সাথে সংশ্লিষ্ট একটি দ্বীপ **টোঙ্গা**তে এসেছে। আর এই সুনামীটি আয়তনে ইন্দোনেশিয়াতে আসা সুনামী অপেক্ষাও ভয়াবহ, যা লক্ষাধিক মানুষকে সলিল সমাধি ঘটিয়েছিল আর বিশ্বের বিভিন্ন দেশে তার ধ্বংসলীলা চালিয়েছিল। টেলিভিশন অন করলে দেখা যায় যে এই সংবাদই পরিবেশন করা হচ্ছে যে সুনামীটি ক্রমাগত তার শক্তি বৃদ্ধি করে এগিয়ে আসছে আর কাল সকালের দিকে নান্দি ফিজিতে এসে আছড়ে পড়ে সমগ্র এলাকাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। ভোর চারটেয় যখন হুযুর ফজর নামাযের জন্য উপস্থিত হন, তখন হুযুর আনোয়ারকে এই তুফান সম্পর্কে রিপোর্ট তুলে ধরা হয়। সেই সাথে হুযুর আনোয়ারের মঙ্গল কামনায় ফোন মাধ্যমে যে সব বার্তা এসেছে সেগুলি সম্পর্কে অবগত করা হয়। হুযুর আনোয়ার ফজরের নামাজ পড়ানোর সময় দীর্ঘ সময় ধরে সেজদা করেন। আর আল্লাহ্ তাআলার সকাশে মোনাজাত করেন। নামাযের পরিসমাপ্তিতে মসীহ্‌র খলীফা জামাতকে উদ্দেশ্য করে বলেন, চিন্তা করবেন না, আল্লাহ্ তাআলা ফযল করবেন, কোন ক্ষতি হবে না। এর পর হুযুর আনোয়ার ফিরে আসেন। আমরা ফিরে এসে যখন টেলিভিশন অন করি তখন দেখি যে টিভিতে এই সংবাদ আসছে যে সুনামীর জোর এখন অনেকটা স্তিমিত। ধীরে ধীরে এর জোর এখন অনেকটা কমে আসছে। এর পর প্রায় দুই আড়াই ঘন্টা পরে এই সংবাদ আসতে থাকে যে এই তুফানের অস্তিত্বই এখন আর নেই। বিশ্ববাসী অদ্ভুত এক দৃশ্য দেখল যে সেই সুনামী যা কয়েক ঘন্টার মধ্যেই লক্ষাধিক মানুষের সলিল সমাধি ঘটিয়ে তাদের অস্তিত্বকে পৃথিবীর মানচিত্র থেকে মুছে দেওয়ার লক্ষ নিয়ে ধেয়ে আসছিল, যুগ খলীফার দোয়ার কল্যানে মাত্র কয়েক ঘন্টাতেই তার অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যায়। সেদিন ফিজির সংবাদপত্রগুলিতে এই সংবাদ পরিবেশন হয় যে সুনামীর সরে যাওয়া কোন অলৌকিক ঘটনার থেকে কম নয়।"

সূরা নূর আয়াত ৫৬ তে আয়াত ইসতেখলাফ-এর মধ্যে আল্লাহ্ তাআলা খিলাফতের যে ঐশী অনুগ্রহরাজির কথা উল্লেখ করেছেন সেখানে এটাও বলেছেন যে তাদের ভীতির অবস্থা পরিবর্তিত হবে নিশ্চয়তা এবং প্রশান্তির মাধ্যমে। অর্থাৎ আল্লাহ্ তাআলার এটাও অঙ্গীকার যে এই সুমহান কল্যানরাজির কারণে তৃতীয় একটা আশিসও বিশ্বাসীদের জামাত লাভ করবে সেটা হল যখনই তারা কোন ভীতি সঞ্চারী অবস্থার মধ্যে পড়বে তখনই আল্লাহ্ তাআলা সেই পরিস্থিতি শান্তি দিয়ে বদলে দেবেন। এ বিষয়ে হলান্ডের একটি ঘটনা রয়েছে:

সম্প্রতি যখন আমি ইউরোপ সফরে গিয়েছিলাম, ফেরার পথে হল্যান্ডে জুমার নামাজের ইমামতি করেছি। সেখানে আমি একজন রাজনীতিবিদকে সম্বোধন করেছিলাম, যিনি একজন সংসদ সদস্য এবং একজন দলের নেতা, যার নাম গির্ট উইল্ডার্স। জুমার খুতবায় আমি তাকে এই বার্তা দিয়েছিলাম যে, তোমরা ইসলাম ও মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে চরম অবমাননা এবং অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করছ। শত্রুতার সব সীমা ছাড়িয়ে গেছেন। এটা থেকে বিরত থাকুন, অন্যথায় আল্লাহ্‌র শাস্তিকে ভয় করুন, যা অঘোষিতভাবে আসে, যা একটি নির্দিষ্ট সময়ে প্রকাশিত হয় এবং আপনার মতো লোকদের ধ্বংস করে দেয়। যে সর্বশক্তিমান খোদা অবশ্যই আপনার মত ব্যক্তিদের পাকড়াও করার ক্ষমতার অধিকারী। আমি আরও বলেছিলাম যে আমাদের কোন পার্থিব ক্ষমতা নেই। আমরা কেবল আমাদের দোয়ার মাধ্যমে আপনার মতো লোকদের চ্যালেঞ্জ করতে পারি। প্রেস সেকশনের ইনচার্জ যখন এই জুমার খুতবার সারসংক্ষেপের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা প্রেস রিলিজের জন্য এই প্রেস বিবৃতি নিয়ে আমার কাছে আসেন, তখন তিনি অন্যান্য সমস্ত বিষয় লিখেছিলেন কিন্তু তিনি এই নির্দিষ্ট বাক্যটি লেখেননি। আমি তখন তাকে বললাম যে এই বাক্যটি অবশ্যই যোগ করুন যে **আমাদের কোন পার্থিব ক্ষমতা নেই**। আমি ঠিক এই কথাই বলেছি, আপনি এবং আপনার মতো সবাই ধ্বংস হয়ে যাবেন এবং এটাই বাস্তবতা। যখন আমরা আমাদের প্রতিপক্ষ এবং যারা আমাদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে তাদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করি, আমরা তা হয় যৌক্তিক কারণে করি, অথবা সর্বোপরি, আমরা আমাদের দোয়ার মাধ্যমে এটি করি।

এই বিশেষ প্রেস রিলিজটি ডাচ রাজনীতিবিদ ওয়াইল্ডার পড়েছিলেন। এরপর তিনি তার সরকারের কাছে একটি চিঠি লেখেন যাতে তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে কিছু প্রশ্ন রাখেন। যখন প্রেসে এটি উল্লেখ করা হয়েছিল, হল্যান্ডের জামাত আমাকে লিখেছিল যে ওয়াইল্ডার এই পদ্ধতিতে প্রশ্ন তুলেছিলেন। মনে হচ্ছিল হল্যান্ড জামাত বেশ চিন্তিত। আমি তাদের উত্তর দিয়েছিলাম, হোম অফিস যদি আপনাকে প্রশ্ন করে তাহলে ভয় পাওয়ারঊরকার নেই এবং আপনার আতঙ্কিত হওয়ারও দরকার নেই। আপনার অবস্থান সম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্যা করুন। ঐ ব্যক্তিই তো এর ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। সেই রাজনীতিবিদ যিনি অনুপযুক্ত কাজ করছেন এবং যিনি মহানবী (সা.) সম্পর্কে অশালীন চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন। তিনি অত্যন্ত কঠোর ভাষা ব্যবহার করেছেন এবং ইসলামকে অপমান করেছেন। আমরা তাতে সাড়া দিয়েছিলাম এবং আমরা যা বলেছিলাম তা হল, আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান এক এবং তিনি তাঁর নবীর সম্মান রক্ষা করবেন। তিনি এমন ব্যক্তিদের ধরে ফেলতে পারেন যারা তাঁর নবীদের অসম্মান করে, তাই আল্লাহ্‌কে ভয় করুন।

তিনি যে প্রশ্নগুলো করেছিলেন তার পরিপ্রেক্ষিতে সরকার কয়েকদিন পর তাদের জবাব দেয়, যা পত্রিকায়ও প্রকাশিত হয়। ওয়াইল্ডারের প্রথম প্রশ্নটি ছিল যে, "আপনি কি এই নিবন্ধটির সাথে পরিচিত যে, বিশ্ব মুসলিম নেতা ডাচ রাজনীতিবিদ গির্ট ওয়াইল্ডার্সকে সতর্কবার্তা পাঠিয়েছেন ?" স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তাকে উত্তর দিয়েছিলেন, "হ্যাঁ আমি এই নিবন্ধটি সম্পর্কে অবগত এবং এটি পড়েছি।"

ওয়াইল্ডারের দ্বিতীয় প্রশ্নটি, আমার নাম উদ্ধৃত করে চিঠিটি ছিল, "মির্যা মাসরূর আহমদ বলেছেন যে "ভাল করে শুনে রাখুন, আপনি, আপনার দল এবং আপনার মতো প্রতিটি ব্যক্তি শেষ পর্যন্ত ধ্বংস হয়ে যাবে"। এই উদ্ধৃতিটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি নিজেই বলেছিলেন, 'স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এই ক্ষতিকর বার্তার বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়ার পরিকল্পনা করছেন?' স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জবাব দিয়েছিলেন, "প্রেস রিলিজ অনুসারে, মির্যা মাসরূর আহমদ বলেছেন যে এই ধরনের মানুষ এবং দলগুলি বিশৃঙ্খলা বা সহিংসতা বা অন্য কোনও ধর্মনিরপেক্ষ কার্যকলাপের দ্বারা ধ্বংস হয় না, বরং কেবল প্রার্থনার মাধ্যমেই ধ্বংস হয়। আমি এই বিবৃতিতে এমন কিছু দেখি না যা বিশৃঙ্খলা বা সহিংসতাকে উস্কে দেয় বা এটির কারণ হতে পারে। এই কারণে আমি জামা'আত আহমদিয়া (আহমদিয়া মুসলিম সম্প্রদায়) এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কোন কারণ দেখি না।"

তারপরে, তার তৃতীয় প্রশ্ন ছিল, "হল্যান্ডের আহমদিয়া মুসলিম সম্প্রদায় কীভাবে বিশ্বব্যাপী আহমদিয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের সাথে এবং মির্যা মাসরূর আহমদের সাথে সংযুক্ত?" স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী উত্তর দিয়েছিলেন, "আহমদিয়া মুসলিম কমিউনিটি হল্যান্ড বিশ্বব্যাপী আহমদিয়া মুসলিম সম্প্রদায়েরই অংশ।"

সুতরাং খিলাফত হল সেই দুর্গ যার প্রাচীর ভীতির আস্ফালন থেকে অনেক উচ্চ। তা সে ভীতি কপটতার হোক বা শত্রুতার। যুদ্ধের হোক কিংবা রাজনীতির। কোন গোষ্ঠির পক্ষ থেকে হোক কিংবা কোন সাম্রাজ্যের পক্ষ থেকে। সবক্ষেত্রেই খিলাফত হল শান্তি ও নিরাপত্তার প্রকৃত কান্ডারী। বড় বড় শাসনক্ষমতার অধিপতিরাও খিলাফতকে বিন্দুমাত্র ক্ষতিসাধন করতে পারেনি। ইতিহাস সাক্ষী, যে শাসন ব্যবস্থাই খিলাফতের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে, সে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে নিঃশেষ হয়ে গেছে।

খিলাফত এমনই একটি সঞ্জীবনী মহীরূহ, যে এর সাথে সংশ্লিষ্ট থাকবে, তা সে পত্রাচারের মাধ্যমেই হোক কিংবা হুযুর আনোয়ারের প্রতি আন্তরিক দোয়ার মাধ্যমে নিজেকে তাঁর সান্নিধ্যে রেখে, আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে অবশ্যই প্রশান্তির বেষ্টনীর মধ্যে স্থান দেবেন।

আইভরী কোস্টের এক যুবক পাইলটের এক বছরের কোর্সের জন্য বেলজিয়ামে এসেছিলন। এখানে হুযুর আনোয়ারের সাথে তাঁর সাক্ষাতের সুযোগ হয়। তিনি বলেন, হুযুর আনোয়ারের প্রায়ারই ফল যে, তিনি পাইলট হওয়ার জন্য নির্বাচিত হয়েছেন।

ঘটনাটি হল কয়েক বছর পূর্বে যখন তিনি আইভরী কোস্টের জলসা সালানায় অংশগ্রহণ করেছিলেন, তখন সেখানে তার বন্ধু তাকে বলে যে আইভরী কোস্ট তাদের চাকরি দেওয়ার জন্য প্রতিযোগিতা করাচ্ছে- এই সংক্রান্ত তিনি একটি বিজ্ঞাপন দেখেছেন। কিন্তু ফাইল জমা করার অন্তিম তারিখ পার হয়ে গিয়েছে। তিনি বলেন তারিখ পার হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও আমি হুযুর আনোয়ারকে দোয়ার জন্য পত্র লিখি, আর সেই সাথে আমার ফাইলও জমা করে দিই। কিছুদিন পরে উত্তর আসে যে, যদিও আপনি নির্ধারিত সময়ের পরে ফাইল জমা করেছিলেন, তথাপিও আপনাকে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে। এরপর তিনি প্রতিযোগিতার

(এরপর ২০ পাতায়.....)

খেলাফত, শান্তি ও ন্যায়বিচার

-হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.)কর্তৃক প্রদত্ত ভাষণ

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ৫ম খলিফা হযরত মির্যা মাসরুর আহমদ (আই.) বিগত ৮ নভেম্বর, ২০১৪ তারিখে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, যুক্তরাজ্য আয়োজিত ১১তম জাতীয় শান্তি-আলোচনা সভায় মূল-বক্তব্য দান করেন। এ বক্তব্যে তিনি ওঝাওঝাও অন্যান্য চরমপন্থী গ্রুপের কার্যকলাপের নিন্দা জ্ঞাপন করে পর্যায়ক্রমিক ভাবে ওগুলোকে 'অনৈসলামিক'- আখ্যায়িত করে বলেন, ওগুলো বিশ্বে মারাত্মক এক-ভীতির নেটওয়ার্ক ছড়াচ্ছে। পবিত্র কুরআন থেকে বিস্তারিত উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি (আই.) এটা প্রমান করেন যে, ইসলাম হচ্ছে অনাবিল শান্তির ধর্ম, যেটা সমাজের সর্বস্তরে পারস্পরিক সম্মানবোধ এবং সমঝোতা বিস্তার করে। তিনি (আই.) এ প্রশ্নও উত্থাপন করেন যে, ওঝাওঝাএর মত চরমপন্থী দলগুলো তাদের অর্থ ও সমর্থন কীভাবে সংগ্রহ করে থাকে?

এ অনুষ্ঠানটি লন্ডনের বায়তুল ফুতুহ মসজিদে হাজারের অধিক শ্রোতা-দর্শকের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয়, যার মধ্যে সরকারের মন্ত্রীবর্গ, বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত, উভয় কক্ষের পার্লামেন্ট-সদস্যবৃন্দের সংখ্যা ছিল ৫৫০ জনেরও বেশী। এতে আরো অনেক উচ্চ-পদস্থ কর্মকর্তা ও সম্মানিত অতিথি-বৃন্দও ছিলেন। এ বছরের এ শান্তি সম্মেলনের বিষয়বস্তু ছিলো- 'খিলাফত, শান্তি ও ন্যায় বিচার'।

উন্নয়নশীল বিশ্বের শিশুদেরকে খাদ্য প্রেরণ ও শিক্ষাদানে বিশেষ ভূমিকা রাখার স্বীকৃতিস্বরূপ যুক্তরাজ্যের Mary's Meals Gi CEO-Magnus Mac Farlane-Barrow-কে হুযূর (আই.) এই অনুষ্ঠানে আহমদীয়া মুসলিম শান্তি-পুরস্কার প্রদান করেন। মূল বক্তব্যের আগে যুক্তরাজ্য আহমদীয়া মুসলিম জামাতের জাতীয় প্রেসিডেন্ট জনাব রফিক হায়াত, উইম্বেল্‌ডনের লর্ড তারিক আহমদ, সম্প্রদায়-বিষয়ক মন্ত্রী সিওভ্যাইন ম্যাকডোনার্ঘ- এমপি এবং আহমদীয়া মুসলিম জামাতের জন্য সর্বদলীয় পার্লামেন্টারী গ্রুপের প্রধান-সম্মানিত এড্‌ব্যারি, এমপি (অব.) সহ আন্তর্জাতিক-উন্নয়নের জন্যে এ্যানার্জি ও জলবায়ুপরিবর্তন সংক্রান্ত সচিব সম্মানিত জাষ্টিন গ্রীনিং, এমপি (অব.) বক্তব্য প্রদান করেন এবং শ্রদ্ধেয় কেভিন ম্যাকডোনাল্ড এমেরিটাস অব সাউথবার্ক ভ্যাটিকানদের পক্ষ থেকে এক বিশেষ-বার্তা পাঠ করেন।

তাশাহুদ, তা'উয, তাসমিয়া ও সূরা ফাতেহা তেলাওয়াতের পর হুযূর (আই.) বলেন, "সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, আস্‌সালামুআলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সর্বপ্রথম আপনাদের সবাইকে, যারা এ বছরের এই শান্তি সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছেন, তাদেরকে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আপনাদের অধিকাংশ লোকই অবহিত আছেন যে, এ বার্ষিক সম্মেলনটি বিগত দশক ধরে প্রতি বছরই অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে এবং আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বর্ষ-পঞ্জিতে এটা এক স্থায়ী কর্মসূচী হয়ে গিয়েছে। আজ রাতে একটি রাষ্ট্রীয়- স্মরণ দিবসও অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে, ফলে কতিপয় আমন্ত্রিত-অতিথি উপস্থিত না-ও হতে পারেন। এরপরও, যারা এখানে এসেছেন, তাদের সবার কাছেই আমি খুবই কৃতজ্ঞ। এ অনুষ্ঠানে আপনাদের অংশগ্রহণ এটা অবশ্যই প্রমাণ করে যে, আহমদীয়া মুসলিম জামাতের আঙ্গিকে আপনারা শান্তি সম্পর্কে বিশেষ কিছুশুনতে চান। কারণ, 'বিশ্ব-শান্তি' বিষয়ে আর সমগ্র বিশ্বজুড়ে যে সংঘর্ষ ঘটে চলছে, সে বিষয়ে আজকের বিশ্বে অনেক কথাই বলাবলি হচ্ছে। বিশ্বের বর্তমান অবস্থা অধিকাংশের জন্য অবশ্যই ভয় ও উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই বিরাট দুঃখজনক অবস্থাদৃষ্টে একথা স্বীকার করতে আমার কোনই দ্বিধা নেই যে, বিশ্বে আমরা যে অশান্তি ঘটতে দেখি, তার অধিকাংশই কতিপয় নামসর্বস্ব মুসলমানদের কর্মের ফলে ঘটেছে। যে কোন শান্তিকামী মুসলমান, যে নিজ-ধর্মকে বুঝে, তার জন্যে এটা এক বিরাট দুঃখ ও আশাহত হওয়ার কারন বটে। বিগত বছর জুড়ে একটি বিশেষ দল বা গোষ্ঠি সন্ত্রাসের এক নেটওয়ার্ক ব্যাপকভাবে ছড়িয়েছে এবং সেটা বিশ্বের জন্য বিরাট এক দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাড়িয়েছে। ISISনামে পরিচিত সন্ত্রাসী-দলটির কথাই আমি বলছি। এই সন্ত্রাসী-দলটির কার্যকলাপের প্রতিক্রিয়া কেবল মুসলিম দেশগুলোর ওপরই পড়ছে না বরং ইউরোপের দেশগুলোও এর ক্রুরতা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। আমরা দেখতে পাই যে, ইউরোপ এবং বিশ্বের অন্যান্য অংশ থেকে বেশ কিছুসংখ্যক মুসলমান যুবক, যারা যে কোনভাবেই হউক, ISIS ইসলামের এক সঠিক-চিত্র উপস্থাপন করে এমনই কথা বিশ্বাস করে তাদের আদর্শটি তারা সমর্থনও করে। এসব কারণে তারা তাদেরকে সাহায্য করতে এমনকি তাদের জন্য যুদ্ধ করতেও মনস্থ করেছে। এখানে, এই যুক্তরাজ্য থেকেও একথা বলা হয়ে থাকে যে, প্রায় পাঁচশ' লোক, যাদের অধিকাংশই হচ্ছে মুসলমান-যুবক, এমনই এক সন্ত্রাসী দলে ভর্তি হয়ে ISIS এর পক্ষে যুদ্ধ করতে ইতোমধ্যে সিরিয়া ও ইরাক রওনা হয়ে গেছে, তারা এ মিথ্যা-দাবীও করে যে, যুদ্ধটি করা হচ্ছে ইসলামের নামে। আমরা যদি ইউরোপের সেসব মুসলমানদের সংখ্যার দিকে তাকাই, যারা তথাকথিত এই 'জিহাদ' এর জন্য যাত্রা শুরু করেছে, তবে আমরা এটা অনুধাবন করতে পারি যে, উক্ত সংখ্যার লোক, যারা যুক্তরাজ্য থেকে ইরাক ও সিরিয়া যাচ্ছে, সে সংখ্যাটি জার্মানী অথবা বেশীর ভাগ অন্যান্য ইউরোপীয় দেশগুলো থেকে যারা যাচ্ছে তাদের সংখ্যার চাইতে তুলনামুলকভাবে বেশী। এটা হচ্ছে যুক্তরাজ্যের জন্যে চরম-বিপজ্জনক এবং এক বিরাট চিন্তার বিষয়; ISIS -এর কর্মসূচী ও উদ্দেশ্য এবং তাদের তথাকথিত 'খলিফা'এর সবটা হচ্ছে অত্যন্ত ভয়ংকর ও সম্পূর্ণভাবে বর্বর আচরণ বিশেষ। উল্লেখ করা হয়, তাদের 'খলিফা' বলে, বিশ্বের কাছ থেকে সে প্রতিশোধ নিতে চায় এবং রাষ্ট্রগুলো ও দেশগুলো দখল করে নিতে চায়। মুসলমানদেরকে সে সমগ্র বিশ্বের প্রভুবানাতে চায় এবং সব অমুসলমানকে দাসে পরিণত করতে চায় অথবা 'মুসলমানদের অধিকারভুক্ত সম্পদ' বানাতে চায়। সে আরো বলে, সেসব লোকের প্রত্যেকের বিরুদ্ধেই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া উচিত, যারা কোন মুসলমানকে যেকোন ভাবেই হোক আঘাত দেয় আর প্রত্যেক দেশের প্রতিটি ব্যক্তির ওপর তার কথিত শরীয়ত-আইন প্রযোজ্য হওয়া উচিত।

এছাড়াও অন্যান্য ধর্ম অথবা গোত্রের মহিলাদের অধিকারকে সে হরন করার আকাঙ্খা রাখে, আকাঙ্খা রাখে তাদের দমন করতে এবং রক্ষিতায় পরিণত করতে, অথবা তাদেরকে তাদের স্ত্রী হতে বাধ্য করতে। ISIS প্রতিটি সেই ধর্ম অথবা গোত্রকে ধ্বংস করে দিতে চায় বিশ্বাসগত দিক থেকে যারা ভিন্নতা রাখে এবং বিদ্যমান মুসলমান সরকারগুলোকে তাদের নিজ ক্ষমতা থেকে অপসারণ বা উৎখাত করার ইচ্ছাও তারা পোষন করে।

এসব কথা যদি এভাবেই সত্য হয়, তবে তাদের কৌশল ও দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে সামগ্রিক বিনাশ সাধনের সুদূর-প্রসারী এক অপকর্মের কৌশল এবং তাদের মৌলিক উদ্দেশ্য হচ্ছে বিশ্বের শান্তি ধ্বংস ও নির্মূল করা। এটা সম্পূর্ণ অসম্ভব ও অবাস্তব এক আকাঙ্খা যে, ISIS কিংবা অন্য কোন চরমপন্থী দল শেষ পর্যন্ত বিশ্ব দখল করতে কখনো কৃতকার্য হয়ে যাবে।কারণ, এটা খুবই স্পষ্ট, তাদের পরিকল্পনা সম্পূর্ণ ভাবেই বিবেক-বর্জিত এবং স্বেচ্ছাচারী-চিন্তাভাবনার ওপর প্রতিষ্ঠিত, আর তা সম্পূর্ণরূপে মানবতা বিবর্জিতও বটে। এতদসত্ত্বেও তাদের চলার এই পথ থেকে তাদেরকে বিচ্যুত করা না হলে তাদের অবসান ঘটার পূর্বেই বিশ্ব এক বিশাল পরিমান ক্ষতি ও ধ্বংসের মুখে পতিত হবে। সন্ত্রাস ও ধ্বংসের অনেকগুলো ঘটনায় আমরা এটা প্রত্যক্ষ করেছি যে, কোন সহযোগীতা ও সমর্থন ছাড়া কোন একক-ব্যক্তি এমনটা ঘটাতে পারে না।

উদাহরণস্বরূপ, যুক্তরাষ্ট্রে প্রত্যেক নূতন মাসেই নি:সঙ্গ এক ব্যক্তি কর্তৃক স্কুলে গুলি বর্ষনের মতো ন্যাক্কারজনক কর্মের কারণে ডজন ডজন নিস্পাপ শিশু নিহত হবার দুঃখজনক রিপোর্ট প্রকাশিত হচ্ছে। এভাবে শুধুএটাই চিন্তা করে দেখুন, একজন সন্ত্রাসী দ্বারা দুঃখ, কষ্ট ও বেদনার কত ঘটনাই না ঘটতে পারে, যার কারণে বিশ্বের বিভিন্ন অংশে হতাশাগ্রস্থ ও ছিন্নমূল লোকেরা একত্রিত হচ্ছে, আর এই অন্যায়ের প্রতিকারে তারা নিজেদের প্রাণ দিতেও প্রস্তুত।

এটা এক বাস্তব-সত্য যে, এদলটিতে কেবল আগ্রাসী ব্যক্তিরা রয়েছে শুধুতাই নয়, বরং তারা উন্নত-মানের ভারী অস্ত্র-শস্ত্রে এবং গোলন্দাজ-বাহিনী দ্বারা পর্যাপ্তভাবে সুসজ্জিতও। প্রকৃতই প্রশ্নাতীত কোন ব্যাপার এটা নয়, ঘটনাচক্রে পারমানবিক অস্ত্রও তাদের হাতে এসে যেতে পারে। আমরা জানি, এসব সন্ত্রাসী দল চিরস্থায়ী অথবা দীর্ঘস্থায়ী কোন সাফল্য অর্জন করতে পারবে না। কিন্তু এটা সম্ভব যে, অল্প কিছুদিনের মধ্যে তারা কতিপয় অঞ্চল দখল করতে পারে এবং বিশাল এক ধ্বংসযজ্ঞ ঘটাতে পারে। ISIS - এর সাথে ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র সেসব দলের যে-কোনটিরই সম্পৃক্ততা থাকতে পারে যাদের একই রকম আদর্শ বিদ্যমান। এসব বিষয় বিবেচনা করা হলে, ওঝাওঝাবিশ্বের জন্য আজ ভয়াবহ এক হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে, এতে কোনই সন্দেহ থাকেনা।

ইসলামের নামে ঘটানো এসব ঘটনা শান্তি প্রিয় সব খাঁটি মুসলমানকে দুঃখ ও যন্ত্রনা দেয়। কারণ, পাশবিক ও অমানবিক এমন কার্যকলাপের সাথে কোন ধর্মেরই কোন প্রকার সম্পর্ক থাকার কথা নয়। বরং প্রত্যেক উপায়ে এবং প্রতিটি পর্যায়ে ইসলামের আসল-শিক্ষাগুলো সব মানুষের জন্যই শান্তি ও নিরাপত্তার নিশ্চিত শিক্ষাই বটে। পবিত্র কুরআনের দিকে যদি আমরা দৃষ্টি দিই এবং ইসলামের পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবন ও চরিত্রের দিকে তাকাই, তবে এটা সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয় যে, প্রথম দিকের মুসলমানগণ কোন যুদ্ধ অথবা অস্থিরতা কখনো শুরু করেনি। মুসলমানরা যদি কখনো কোন যুদ্ধে অংশ নিতেন, তবে সে যুদ্ধ ছিল সম্পূর্ণভাবেই প্রতিরোধ-মূলক এবং ওগুলোর একমাত্র উদ্দেশ্যই ছিলো অত্যাচারীদেরকে তাদের নিষ্ঠুরতা থেকে নিবৃত্ত করা, কখনই তাদের নিজস্ব শ্রেষ্ঠত্বের ওপর জোর দেয়া অথবা অবিচারকে সমর্থন করার জন্য নয়। তারা কখনই কোন ভূ-খণ্ড অথবা জাতিকে পদানত করতে, কিংবা মানুষকে বশ্যতা স্বীকার করাতে চাইতেন না।

মহানবী (সা.) এ সত্যের সাক্ষ্য বহন করেন যে, তাঁর নবুওতের প্রাথমিক-বছর গুলোতে তাঁর নিবাস-শহর মক্কায় তিনি শুধুভালোবাসা ও স্নেহের মাধ্যমেই ইসলামের শিক্ষা ছড়াতে চেয়েছেন। সে সময় মক্কাবাসীরা তাঁকে কেবল প্রত্যাখ্যানই করেননি, বরং তাঁর সাথে চরম নিষ্ঠুর ও নির্দয় ব্যবহার করেছে, আর তাঁর অনুসারীরা নির্মমভাবে এতোদূর পর্যন্ত নিগৃহীত হয়েছেন যে, ঐশী-নির্দেশের আওতায় পবিত্র নবী (সা.)-কে মক্কা ত্যাগ করে মদিনা শহরে চলে যেতে হয়েছে।

যাইহোক, হিজরত করার পরও মক্কাবাসীরা মুসলমানদেরকে একাকী

থাকতে তো দেয়ই নি, উপরন্তু পূর্ণভাবে সজ্জিত সেনাদল নিয়ে হিজরতকারী মুসলমানদের ওপর চড়াও হয়েছে। সে সময়ই প্রথমবারের মত আল্লাহ্‌র নির্দেশ মোতাবেক মুসলমানদেরকে আত্মরক্ষার জন্যে যুদ্ধ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। যে কারণে এ অনুমতি দান করা হয়, সেটা পবিত্র কুরআনের সূরা আল হজ্জ-এর আয়াত নং ৪০ ও ৪১ এ বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, যেখানে আল্লাহ্‌ বলেছেন যে, একটি আত্মরক্ষা-মূলক যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হলো, কারণ মুসলমানরা যদি নিজেদেরকে রক্ষা না করে, তবে সমগ্র বিশ্বের শান্তিই বিপন্ন হবে। বিরোধীরা কেবল ইসলামকেই মুছে ফেলতে চায়নি, বরং বিশ্ব থেকে সব ধরনের ধর্মই আসলে মুছে ফেলতে চেয়েছে। অতএব

পবিত্র কুরআন বর্ণনা করে যে, অনুমতিটি যদি দেওয়া না হতো , তবে চার্চ, সন্যাসাশ্রম, গীর্জা, মসজিদ অথবা ইবাদতের জন্য নির্ধারিত অন্য কোন স্থানই নিরাপদ থাকতো না। এমতাবস্থায়, মুসলমানদেরকে কেবল ইসলাম রক্ষা করার জন্যই পাল্টা যুদ্ধ করার অনুমতি দেওয়া হয়নি, বরং বর্ণিত আয়াতের ভিত্তিতে সব ধর্মের রক্ষার্থেই যুদ্ধ করতে বলা হয়েছে।

এ আয়াতের আলোকে আপনারা নিজেরাই বুঝতে পারেন যে, আজকের এই পোশাকী মুসলমানরা কতই না ভুল পথে আছে, যারা এ দাবী করে যে, অমুসলিমদেরকে হত্যা করা, তাদের ভূমি জবর দখল করা অথবা তাদেরকে দাস বানানো অনুমতিযোগ্য। বাস্তবতা হচ্ছে, ইসলাম হচ্ছে সেই ধর্ম, যা প্রত্যেক মানুষকে স্বাধীনতা ও স্বাধীকার নিয়ে বেঁচে থাকার অধিকার প্রদানের অঙ্গীকার করে। আর ইসলাম হচ্ছে সেই ধর্ম, যেটা প্রত্যেক মানুষকে শান্তি ও সৌহার্দপূর্ণ অধিকারের সুরক্ষা দিয়ে জীবন-যাপনের নিশ্চয়তা দিয়েছে, তা তাদের ধর্মের পটভূমি যা-ই হোক।

ইতিপূর্বেই আমি এটা উল্লেখ করেছি, মহানবী (সা.) কিভাবে তাঁর অনুসারীদেরকে সাথে নিয়ে মদিনায় চলে গিয়েছিলেন এবং কি পদ্ধতিতে মুসলমানরা সেখানকার স্থানীয়সমাজে নিজেদেরকে খাপ খাইয়েছিলেন, সেটাই ছিলো মক্কা থেকে হিজরত করে এক নূতন সমাজে সংঘবদ্ধ হওয়ার এক খাঁটি আদর্শ। মুসলমানরা পৌঁছার আগে মদিনানগরীতে বসবাস-রত দু'টো দল ছিলো, যারা হলো ইহুদী ও মরুবাসী আরবী। মুসলমানরা উপস্থিত হবার পর সেখানে হয়ে গেলো তিনটি দল–মুসলমান, ইহুদী ও অমুসলিম-আরবীয়। মহানবী (সা.) তাৎক্ষনিকভাবেই উল্লেখ করলেন, এটা জরুরী যে, তারা সবাই শান্তি এবং ঐক্যের সাথে বসবাস করবে এবং এ কারণে তিনি তাদের মধ্যে একটি শান্তি-চুক্তি করার প্রস্তাব করলেন। এই চুক্তির শর্ত মোতাবেক প্রত্যেকটি দল এবং গোত্রকে তাদের প্রাপ্য অধিকার দেওয়া হয়েছিল। সব দলের মানুষের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছিলো এবং পূর্ব থেকে চালু যেকোন আন্ত-গোত্রীয় প্রথার প্রতিও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয়েছিলো। এটাও স্বীকৃত হয়েছিলো যে, মক্কা থেকে কোন লোক কোন ক্ষতি অথবা দুষ্কর্ম করার মনোবৃত্তি নিয়ে যদি মদিনায় আসে, তাকে মদিনার কেউ-ই কোন আশ্রয় দিবে না, অথবা তার সাথে কোন চুক্তিতে জড়াবে না।

উপরন্তু, যদি সাধারন এক শত্রু মদিনা আক্রমণ করে, তবে তিনটি দলই সম্মিলিতভাবে শহরটিকে রক্ষা করবে, যদিও এমনটা নির্ধারিত ছিলো যে, মুসলমানরা কখনো আক্রান্ত হলে অথবা মদিনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করলে মুনলমানদের পক্ষে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করতে অ-মুসলিমদেরকে বাধ্য করা যাবে না। এছাড়াও, অন্যান্য দলের সাথে ইহুদীদের কোন চুক্তি হয়ে থাকলে সে চুক্তিকেও মুসলমানরা মেনে চলবে। ইহুদীরা তাদের নিজ ধর্ম নিয়েই চলবে আর মুসলমানরাও তাদের নিজ ধর্মের অনুসরণ করে চলবে।

এ চুক্তির শর্তগুলো যখন তিনটি দলই মেনে নিলো, তখন সব দলেরই পারস্পরিক সম্মতিতে এটাও স্বীকৃত হলো যে, মহানবী (সা.) হবেন সম্মিলিত এই ব্যবস্থাপনার 'রাষ্ট্রপ্রধান'। তদসত্ত্বেও, যেভাবে আমি পূর্বেই বলেছি, ইহুদীদেরকে ইসলামী-শরীয়ত মানতে বাধ্য করা যাবে না, বরং তাদের থাকবে শুধুমাত্র ইহুদীদের ধর্ম-বিধান ও রীতি পালনের বাধ্য-বাধকতা। এটাই ছিল সেই পারস্পরিক-শ্রদ্ধা, যা ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা মহানবী (সা.)-এর সহনশীলতা ও পারস্পরিক-শ্রদ্ধার উদাহরণ। এতসব নমুনা থাকা সত্ত্বেও আজ ISIS এই দাবী করে যে, শরীয়া-আইন প্রত্যেক ব্যক্তির ওপরই খাটানো হবে, তা তাদের নিজ ধর্ম-বিধান যাই হোক না কেন? সেযুগে মহানবী (সা.) সেই একই চুক্তির আওতায় নারীদের অধিকারও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে স্পষ্টভাবে এটা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল যে, কোন নারীকেই তার বাড়ী থেকে জোর করে বের করে দেওয়া অথবা তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে বিবাহ দেয়া যাবে না। তাহলে ISIS-এর পক্ষ থেকে করা এ দাবী কিভাবে সঠিক হয় যে, অ-মুসলমান মেয়েদেরকে তাদের অধিনস্থ অথবা অস্থাবর সম্পত্তি

হিসেবে গণ্য করা যাবে? ঐ চুক্তি মোতাবেক কোন মানুষকে কখনোই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য করা যাবে না, বরং এটাও সরাসরি উল্লেখ আছে যে, মদিনার ইহুদী ও অ-মুসলিমদের সাথে 'মুসলমানদের ভাই' হিসেবে ভালোবাসা ও সহানুভূতিপূর্ণ আচরণ করতে হবে। অতএব, এটাই হচ্ছে সংক্ষেপে সেই চুক্তি, যা মুসলমানরা মদিনায় পৌঁছার পর মদিনায় বসবাসকারী সকল গোত্রকে একতাবদ্ধ করেছিলো।

ইতিহাসও এ সত্যের সাক্ষ্য বহন করে যে, মুসলমানরা এ চুক্তি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিল। অন্যান্য দলগুলো দ্বারা কখনো চুক্তিটি যদি ভঙ্গ হোত মদিনার স্বীকৃত-নেতা হিসেবে মহানবী (সা.)-কে সেসব ব্যক্তি অথবা দলের সাথে কথা বলতে হোত, যারা চুক্তির খেলাপ অথবা কোন ত্রুটিপূর্ণ কাজে জড়িয়ে পড়তো। কিন্তু এ ধরনের শাস্তিগুলো চুক্তির শর্ত মোতাবেক সুন্দরভাবে দেয়া হোত, এবং কোনরূপ অবিচার হোত না। এভাবে, এটাই হচ্ছে ইসলামী-সরকারের সত্যিকার প্রকাশ, যার ভিত গড়েছেন মহানবী (সা.) আর তাঁকে অনুসরণ করে ৪জন খোলাফায়ে রাশেদীন দ্বারা সেই সরকার পদ্ধতি-ই জারী ছিলো, এবং ইসলামের ১ম শতাব্দী জুড়েই তা কায়েম ছিলো। আর সে কারণে, ISIS অথবা অন্য কোন মুসলিমসরকার যদি এসব সত্যিকার ন্যায়বিচার ও সাম্যের এসব নীতির বিরুদ্ধে কাজ করে, তবে সেটা করা হবে কেবলই তাদের নিজেদের ব্যক্তিগত অথবা রাজনৈতিক-স্বার্থ সিদ্ধির জন্য। এমনকি, যদি তারা ইসলামের নামে এ দাবী করে বসে, তবে সত্য হচ্ছে এটাই যে, ইসলাম অথবা মহানবী (সা.)-এর শিক্ষাগুলোর সাথে তাদের এ হেন কাজের দূরতম কোন সম্পর্ক নেই।

মহানবী (সা.) এর আবির্ভাবের পূর্বেকার আরবের ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই যে, সেটা ছিল এমনই এক সমাজ, যেখানে প্রত্যেকটি গোত্র যুদ্ধ এবং রক্তপাতের মাধ্যমে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চাইছিল। তথাপি সেই-একই সমাজে পবিত্র নবী (সা.) এমন এক বিপ্লব সাধন করেছিলেন যে, তাদের মধ্যকার প্রতিটি দলের সাথে তাদের নিজ ঐতিহ্য ও ধর্মীয়বিশ্বাস মোতাবেক আচরন করা হতো। কেউ যদি এক নিরপেক্ষ ও প্রভাবমুক্ত হয়ে শুধুমাত্র ইসলামের ইতিহাস অধ্যয়ন করে, তবে সে (পুরুষ অথবা নারী যে-ই হোক না কেন) দেখতে পাবে যে, পবিত্র নবী (সা.)-এর প্রারম্ভিক-যুগের এবং ৪জন খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলের মুসলমানদের ব্যবহার ছিলো একান্তই আপনজন সুলভ। কোন যুদ্ধে তারা কখনোই আক্রমণকারী ছিলেন না, অথবা কখনোই তারা কোন রাজ্য দখল করতে চাননি। যেখানেই তারা ইসলামের শিক্ষা বিস্তার করতে চেয়েছেন, তারা কেবলই এক সম্পূর্ণ-শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে তা করতে চেয়েছেন। উদাহরণ স্বরূপ, চীন এবং দক্ষিন ভারতে ইসলামের বিস্তার লাভ ঘটলেও ইতিহাসের কোথাও এটা উল্লেখ নেই যে, কোন মুসলমান-সেনাদল কখনো সেইসব জাতিকে আক্রমন করেছে, এরপরও সেইসব দেশ এবং অন্যান্য জাতিতে ইসলাম শান্তিপূর্ণ উপায়েই বিস্তার লাভ করেছে। পরবর্তী সময়ে কতিপয় মুসলমান সম্রাট বিভিন্ন রাজনৈতিক কারণে যুদ্ধ শুরু করেছিলো, যার জন্য কেবলই তাদেরকে দোষ দেয়া যায় না। সেসব যুদ্ধে দখলকৃত দেশগুলোতে কখনোই জোর করে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করাা হয়নি। পবিত্র কুরআন অবশ্যই এধরনের বলপ্রয়োগ সম্পূর্নরূপে নিষেধ করে এবং শান্তিপূর্ণ ভাবে প্রচারের শিক্ষা দান করে।

ইতিপূর্বে যেভাবে বলেছি, আল্লাহ্‌ যেখানে প্রতিরোধ-মূলক যুদ্ধের অনুমতি দিয়েছেন, তা সকল ধর্মকে রক্ষা করার জন্য, শুধুমাত্র ইসলামকে রক্ষা করার জন্য নয়। পবিত্র কুরআনের বহু আয়াতে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌ যুদ্ধের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা নির্ধারন করেছেন। যেমন:- সূরা আল বাকারা-র ১৯১ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্‌ প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধের নীতি প্রতিষ্ঠা করে পবিত্র নবী (সা.)-কে কেবল তাদের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করতে বলেছেন, যারা তাঁর (সা.) বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেছিল, তবে তাতে সীমালংঘন অথবা নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করতে নিষেধ করেছেন। কারণ হচ্ছে, আল্লাহ্‌ সেইসব লোককে ভালোবাসেন না, যারা অন্যায়কারী।

পুনরায়, সূরা আন নহল-এর ১২৭ নম্বর আয়াতে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌ মুসলমানদেরকে কখনোই সীমালংঘন অথবা আইন ভঙ্গ না করার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ্‌ বলেন, যুদ্ধে বিজয় লাভ করলে অপরাধীকে শাস্তি দেয়া যেতেই পারে, তবে সেটা দিতে হবে ঠিক সেই পরিমাণে, যতটুকুঅন্যায় করা হয়েছে।

পুনরায়, সূরা আল বাকার-র ১৯৪ নম্বর আয়াতে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌ বলেছেন, যুদ্ধ চলাকালে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে কেবল ততক্ষণই যুদ্ধ করা উচিত, যতক্ষণ নিপীড়ন বন্ধ না হয়েছে, এবং এরপর পুনরায় ধর্ম প্রচার করা যেতে পারে। এর অর্থ হচ্ছে, অত্যাচারী যদি বিরত হয়, এবং অশান্তি যদি শেষ হয়ে যায়, তবে তাদের বিরুদ্ধে এরপর কোন প্রকার ঔদ্ধ্যত্ব প্রদর্শন করা যাবে না।

সূরা আল আনফাল-এর আয়াত নম্বর ৬৮-তে আল্লাহ্‌ বলেছেন যে, একজন নারীকে যুদ্ধে লিপ্ত অবস্থায় পাওয়া ছাড়া অন্য কোনভাবে কোন মেয়াদকাল বন্দী রাখা শোভনীয় নয়, কারন এমনটি করা হলে খোদার ভালোবাসার চাইতে সম্পদ ও ক্ষমতা লাভের প্রতিই অধিক আকর্ষণ থাকা সাব্যস্ত হয়। এর দ্বারা এটাই প্রমানিত হয় যে, যুদ্ধকালীন সময় ছাড়া অন্য সময়ে কাউকে বন্দী হিসাবে রাখা নিষেধ, আর তা সত্ত্বেও আজকাল আমরা দেখতে পাই, তথাকথিত এসব ইসলামপন্থীরা অসংখ্য নিরাপরাধ লোককে জোর করে বন্দী করে রাখছে আর অসহায় প্রতিরক্ষা-বিহীন নারীদেরকে রক্ষিতা বানাচ্ছে। পবিত্র কুরআনে সূরা মুহাম্মদ- এর ৫নম্বর আয়াতে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌ বলেছেন, যুদ্ধবন্দীদেরকে যুদ্ধ শেষ হবার সাথে সাথেই মুক্ত করে দেয়া উচিত, হয় এদেরকে কিছুমুক্তিপনের বিনিময়ে স্বাধীন করে দিতে হবে, অথবা আরো উত্তম যে, দয়াপরবশ হয়ে বা অনুগ্রহভরে তাদেরকে ছেড়ে দিতে হবে, আর এটা বন্দী নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্যই প্রযোজ্য। প্রাথমিক যুগে, যুদ্ধরত পুরুষদেরকে উৎসাহিত ও সাহায্য-সহযোগিতা করার জন্য নারীরাও যুদ্ধ ক্ষেত্রে যেতো, আর পরাজিত হলে বন্দী হতো। যাহোক পবিত্র কুরআন ধারাবাহিকভাবে এটা স্পষ্ট করে বলেছে যে, কোন মহিলার সাথে কখনোই কোন নিষ্ঠুর আচরণ করা অথবা তাদের অধিকার হরন করা যাবে না।

কোন যুদ্ধ-বন্দীকে মুক্ত করতে অর্থপ্রদানের বিষয়ে সূরা আল নূরের ৩৪ নম্বর আয়াতে পবিত্র কুরআন বর্ণনা করে

যে, মুক্তিপণের অর্থ প্রদানে কারো সক্ষমতা না থাকলে তার উচিত কিস্তিতে তা গ্রহণ করে বন্দীকে মুক্ত করে দেওয়া। যুদ্ধ-বন্দীদেরকে মুক্ত করা সম্পর্কে এসব আয়াতের বিষয়াদি প্রাথমিক যুগের আলোকে বুঝা উচিত। সে সময় সেই সব ব্যক্তি যারা যুদ্ধ করেছে তারা তাদের নিজ খরচেই যুদ্ধ করেছে এবং নিজস্ব অস্ত্র-শস্ত্র দিয়েই যুদ্ধ করেছে আর সেজন্য তাদের বন্দীদেরকেও মুক্তি দানের জন্য অর্থ গ্রহণের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। যাহোক বর্তমান কালের যুদ্ধগুলোয় সংশ্লিষ্ট সরকারগুলো যুদ্ধের যাবতীয় খরচের জন্য অর্থ-জোগায় এবং সে কারনে যোদ্ধারা ব্যক্তিগতভাবে যুদ্ধে কোন খরচ করে না। সেজন্য যুদ্ধবন্দীদের সাথে কিভাবে আচরন করতে হবে, সেটা নির্ধারণ করার দায়িত্ব হচ্ছে সংশ্লিষ্ট সরকার অথবা আন্তজার্তিক কোন সংস্থার। অতএব এটা এখন কোন ব্যক্তির দায়িত্ব নয়।

দীর্ঘস্থায়ী শান্তির কোন প্রচেষ্টায় বন্দী বিনিময় কর্মসূচিগুলো অথবা জাতিগুলোর মধ্যকার অন্যান্য আচরনগুলো নির্ধারন করার দায় সরকার পর্যায়ে গৃহীত হতে পারে। ব্যক্তিগতভাবে কাউকে বন্দী করার শর্তগুলো এখন আর কার্যকর নেই এবং এরূপ করাটা সম্পূর্ণভাবেই ইসলাম বিরোধী।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ আরো বলেছেন, অন্যদের ধন-সম্পদ অথবা কারো প্রতি তোমাদের ঈর্ষান্বিত বা লোভাতুর দৃষ্টি দেওয়া উচিত নয় এবং সমগ্র বিশ্বের শান্তির জন্যে এই একটিই হলো আজকালের সোনালী নীতি। ইসলামের এই একটি নির্দেশই যদি অনুসরন করা হয়, তবে এক মুসলমান কর্তৃক কখনোই অন্যদের ভূ-খণ্ড, সাম্রাজ্য অথবা সম্পদ দখল করার প্রশ্নই ওঠে না।

পবিত্র কুরাআনের সূরা ইউনুসের ১০০ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন, যেহেতু তিনি হচ্ছেন সর্বশক্তিমান তিনি যদি চাইতেন, তবে সমগ্র বিশ্বকেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করাতে পারতেন। এতদ্সত্ত্বেও আল্লাহ্ মানব জাতিকে তা করতে বাধ্য করেননি এবং পবিত্র নবী (সা.)-কে এ নির্দেশ দিয়েছেন যে, ইসলামের বানী প্রচারে শক্তি প্রয়োগের অনুমতি নেই বরং ধর্ম হচ্ছে প্রত্যেক ব্যক্তির হৃদয় ও বিবেকের একটি বিষয়।

অতএব, এটা সুস্পষ্ট যে, কোন পরিস্থিতিতেই ইসলাম এবং কার্যত: যেকোন ধর্মগ্রহণে জবরদস্তি করা কখনোই অনুমতিযোগ্য নয়। মুসলমানদেরকে অবশ্যই ইসলামের বার্তা প্রচার করতে বলা হয়েছে, কিন্তু সেটাই হচ্ছে সার্বিক কথা। এভাবে সূরা আল কাহ্ফ-এর ৩০নম্বর আয়াতে পবিত্র নবী (সা.)-কে আল্লাহ্ বলেছেন, গোটা বিশ্বকে একথা অবহিত করতে যে তাদের প্রভুর কাছ থেকে এমন একটি সত্য এসেছে যেটা হোল সফলতা ও সমৃদ্ধি লাভের উপায় এবং পৃথিবীবাসী সেটা গ্রহণ অথবা বর্জন করার বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীন। এসব কথা শ্রবণ করা এবং গ্রহণ করার বিষয়টি সবার জন্যেই স্ফটিকের মত স্বচ্ছ। সব মানুষই এসব কথা বিশ্বাস করা বা না করার বিষয়ে স্বাধীন। আর সে কারনে স্বয়ং মহানবী (সা.) যখন ইসলামের বার্তাটি মানুষের কাছে কেবলই পৌঁছানো এবং অন্য কিছুনা করার অনুমতি পেয়েছিলেন, তখন কীভাবে আজকের তথাকথিত মুসলিম নেতারা এর বাইরে যায় এবং এ চিন্তা করে যে ইসলামের পবিত্র নবী (সা.)-এর চাইতেও তাদের অধিক ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব অথবা অধিকার থাকতে পারে?

অতএব, পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের ওপর ভিত্তি করে সংক্ষিপ্তাকারে আমি ইসলামের শিক্ষাগুলোর এক সার-সংক্ষেপ তুলে ধরলাম, যেটা প্রমান করে যে, কতিপয় মুসলিম দলের এমন নিষ্ঠুরতাপূর্ণ কর্মকান্ড সম্পূর্ণ ভাবেই ইসলামের পরিপন্থী।

আপনারা হয়তো আশ্চর্য হবেন-এটা যদি ইসলামের শিক্ষাগুলোর বিরোধী হয়, তাহলে কেন তারা এমনটি করছে? এর সংক্ষিপ্ত জবাব হচ্ছে, যেসব আমি আগেই বলেছি, তারা কেবলই তাদের বৈশ্বিক স্বার্থগুলো পূরণ করতে চাচ্ছে। তাদের উদ্দেশ্য আদৌ আধ্যাত্মিক অথবা ধর্মীয় কিছুনয়। ইসলামের নামে নিষ্ঠুরতা ও রক্তপাতের মাধ্যমে তারা বৈশ্বিক আকাঙ্খাগুলো অর্জন করতে চায়।

আমি আবারো বলি, যেকোন আহমদীমুসলমান অথবা বস্তত: যে কোন শান্তিকামী মুসলমানই এতে তীব্র-কষ্ট অনুভব করে যে, তাদের পবিত্র ধর্মটিকে কলঙ্কিত এবং বিকৃত করা হচ্ছে। যাহোক সেসব ব্যক্তি, সংস্থা অথবা রাজনীতিকদেরকে আমি একথাই বলি যে, তারা কেবলই চরমপন্থী দলগুলোর একগুঁয়েমির ভিত্তিতেই দাবী করে থাকেন যে, ইসলাম হচ্ছে অস্থিরতার একটি ধর্ম।

আমি বিশেষভাবে তাদেরকে এ বিষয়টি বিবেচনা করতে বলবো, এসব দল কীভাবে এমন তহবিল অর্জন করছে যেটা তাদেরকে সন্ত্রাসী-কর্মকান্ড এবং যুদ্ধাস্ত্র সংগ্রহের কাজ এক দীর্ঘ সময় পর্যন্ত চালিয়ে যেতে দিচ্ছে? এ ধরনের উন্নত মানের অস্ত্র-শস্ত্র তারা কীভাবে সংগ্রহ করছে? তাদের কি অস্ত্র-শিল্পের কোন কারখানা আছে? এটা খুবই স্পষ্ট যে, কতিপয় শক্তিধরের সাহায্য ও সমর্থন তারা পাচ্ছে। এটা হতে পারে, তৈল সমৃদ্ধ মুসলিম রাষ্টগুলো থেকে সরাসরি সমর্থন, অথবা এটা হতে পারে, অন্যকোন বৃহৎ শক্তির গোপন সহযোগিতা এর সাথে রয়েছে।

প্রথম যখন ISISখ্যাতি অর্জন করে, তখন এটা বলা হয়েছিলো যে, তারা জাতীয় সেনাদলের অস্ত্র-শস্ত্রের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে এবং কতিপয় অস্ত্রাগার দখল করে নিয়েছেএকথা সত্যও হতে পারে; কিন্তু এটাই তাদের জন্যে পর্যাপ্ত নয় যে, তা দিয়ে তারা এতটা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তাদের কার্যকলাপ চালিয়ে যেতে সমর্থ হবে। একটি নিয়মিত সেনাদলের সরবরাহ-লাইন যদি কেটে দেওয়া হয়, তাহলে তাদের পক্ষে এটা অসম্ভব যে, তারা তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যায়। ISISএর সরবরাহ লাইন অবিরত ভাবেই বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে মনে হয়।

এটা বলা হয়েছে যে, এখন তারা এমনকি বিমান-বিধ্বংসী ক্ষেপনাস্ত্র এবং উন্নত মানের অস্ত্র-শস্ত্রেরও মালিক হয়ে গেছে। এ সবই ISIS এর সরবরাহ লাইনের দিকে ইশারা করে। এটাও এক সাধারন জ্ঞানের বিষয় যে, শত-শত মিলিয়ন ডলারের এত বিশাল এক তহবিল তাদের কী করে রয়েছে? এথেকে এটাও প্রতীয়মান হয় যে, বাহিরের কোন সমর্থনও তাদের সাথে রয়েছে। অনেক কর্মকর্তা, পর্যবেক্ষক এবং মন্তব্যকার খোলাখুলি ভাবেই এ মতটি সমর্থন করেছেন। যেমন-যুক্তরাষ্ট্র সরকারের উর্ধ্বতন এক প্রতিনিধি মিঃ ডেভিড কোহেন, যিনি সন্ত্রাসবাদ ও অর্থনৈতিক গোয়েন্দা বিষয়ক অধ:স্তন সচিব, জনসমক্ষে তিনি উল্লেখ করেছেন" ISIS হচ্ছে- ইতিপূর্বে যতগুলো সন্ত্রাসী দলের মোকাবেলা আমরা করেছি, তাদের মধ্যে সর্ব-বৃহৎ তহবিল প্রাপ্ত।" তিনি বলেন, "প্রতিমাসে তারা কোটি কোটি ডলার খরচ করছে এবং কালোবাজারে প্রতিদিন এক লক্ষ মিলিয়ন ডলারের জ্বালানী তেল বিক্রী করছে"।

একথা আমাদের জিজ্ঞেস করতে হয়, কোথায় এবং কিভাবে এ বিশাল পরিমানের তেলভান্ডারে তারা অবিরত প্রবেশোধিকার পাচ্ছে? বিশ্বের অন্যান্য অংশে জ্বালানী তেলের পরিবহন ও বিক্রীর ক্ষেত্রে মাত্রা নির্ধারন করা হয়ে থাকে। তদ্সত্ত্বেও যেকোন ভাবেই হোক ISISসব রকমের নিয়ন্ত্রন এড়াতে এবং কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা ছাড়া এতো অধিক পরিমান জ্বালানী-তেল অর্জন এবং তা বিক্রী করতেও সক্ষম হচ্ছে, যদিও আমরা সবাই এটা জানি যে, এতো অধিক পরিমান তেলের পরিবহন ও বেচা-কেনা গোপন করে রাখা এতটা সহজ নয়। এটাও বলা হয়ে থাকে যে, দান-খয়রাতের মাধ্যমে ISIS নিয়মিত ভাবেই অর্থ পেয়ে থাকে, কিন্তু তথাপি এর অন্যান্য উৎস থেকে আয়ের তুলনায় এটা হচ্ছে এক সামান্য পরিমান অর্থ। এসব দলের তহবিলের যোগান হচ্ছে এক বড় সমস্যা, কারন এসব হচ্ছে সেই তহবিল, যার মাধ্যমে তারা সুবিধাজনক দল ও ব্যক্তিদেরকে তাদের শিকারে পরিণত করতে পারছে। যেমন-সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদন থেকে বর্নিত হয়েছে যে, ISIS-এ যোগদান করতে কোন পরিবার যদি একজন সদস্যকে পাঠায়, তবে সে পরিবারকে প্রারম্ভিক ভাবেই হাজার-হাজার ডলার এবং পরবর্তীতে নিয়মিত ভাবেই শত-শত ডলার দেওয়া হয়ে থাকে। এজন্যে, এসব দলকে তহবিল যোগান দেওয়ার কাজটি বন্ধ করতে অতিশীঘ্রই কিছুএকটা করা জরুরী। পশ্চিমা-জগৎ এখন বিষয়টি অনুধাবন এবং স্বীকার করতে শুরু করেছে যে, এটা হচ্ছে এমনই এক যুদ্ধ, যেটা আসলেই সরাসরিভাবে তাদেরকেও ক্ষতিগ্রস্ত করছে। যাহোক এ বিষয়টিও বিবেচনাধীন রয়েছে। আসল সত্য এটাই যে, এটা হচ্ছে সমগ্র বিশ্বের বিরুদ্ধেই এক যুদ্ধ।

নিয়মিত এক বিষয় হিসেবে আমরা দেখতে পাই যে, বৃহৎ শক্তিগুলো মুসলিম দেশগুলোর বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কিত নীতিগুলোকে বলিষ্ঠভাবে প্রভাবিত এমনকি পরিচালিত করতে সক্ষম আর সেজন্য প্রশ্ন হচ্ছে, কেন তারা এ ক্ষেত্রে তাদের প্রভাব খাটায়নি যেখানে ন্যায়সঙ্গতভাবেই এটা করা অতীব জরুরী? সব ধরনের চরমপন্থা ঠেকাতে কেনই বা সম্মিলিত, যৌথ এবং সমষ্টিগত এক উদ্যোগ নেওয়া হয় না? এমনকি বর্তমানে যেসব প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হচ্ছে তা এ দলটির যতটুকুধ্বংস সাধন করতে পারে, সেটা তুলনামূলক ভাবে খুবই নগণ্য। আমার মতে, যা ঘটেছে তা কেবলমাত্র মুসলিম বিশ্বের ত্রুটি-বিচ্যুতির কারনে নয় বরং কতিপয় বহির্শক্তি এবং সেনাদল রয়েছে, যারা এ ধ্বংসাত্মক পরিস্থিতি সৃষ্টি করার পেছনে মদদ দিচ্ছে।

কয়েক বছর ধরেই সিরিয়া এবং ইরাকে অভ্যন্তরীন সংঘর্ষ চলছে এবং বহির্শক্তিগুলো সেখানে তাদের তহবিল এবং সেনা অথবা সেনা সমর্থিত বিদ্রোহী দল ও উপদল পাঠাচ্ছে, যেগুলোর যোগান দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে, ফলে সংঘর্ষ বর্তমানে তাদের দাতা-প্রভুদের নিয়ন্ত্রনের বাইরে চলে গেছে। তাদের চরমপন্থী আদর্শগুলোর ভিত্তিতে তারা ত্রাস সৃষ্টি এবং সব ধরনের ভীতি সঞ্চার করে চলেছে। এটা বর্ননা করে আমি এমন কিছুবুঝাতে চাইনা যে, ইতোমধ্যে এ খবর সংবাদ মাধ্যমে খোলাখুলিভাবে জনসাধারনের মধ্যে প্রচারিত হয়নি। ওঝওঝ-এর মতো ত্রাস সৃষ্টিকারী যোদ্ধাদল এমনসব নীতিরই উৎপাদিত ফসল এবং সেটা এখন তাদের ভীতির বেড়াজাল বহুদুর পর্যন্ত ছড়িয়ে ফেলেছে এবং সমগ্র বিশ্বকেই ক্ষতিগ্রস্ত করছে।

আমি আবারো বলি যে, আমার জন্য এটা নিদারুন এক ব্যথা ও চিন্তার কারন যে, এ সবগুলো মন্দকর্মই ইসলামের মতো এক পবিত্র ধর্মের সাথে সম্পর্কযুক্ত করা হচ্ছে। আজকাল এক বিশাল চিন্তার বিষয় এটা যে, পশ্চিমা দেশগুলো থেকেও মুসলমান যুবকরা সিরিয়া ও ইরাকের মতো দেশগুলোতে যাচ্ছে এবং সেখানে তারা মৌলবাদ তথা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে দীক্ষা নিচ্ছে।

এটা খুবই সম্ভব যে, তারা কখনো তাদের স্বদেশে ফিরে গিয়ে বিশ্বের সেই অংশেও আক্রমণ চালাতে অথবা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে পারে। এভাবে এটা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, বেশী দিন আর এটা স্থানীয় অথবা শুধুমাত্র মুসলিমদের ঘটনা হিসাবে থাকছে না-এটা হয়ে যাবে একটি আন্তর্জাতিক বিষয়, এসব চরমপন্থী সংস্থাকে থামাতে প্রয়োজন হচ্ছে বৈশ্বিক একটি সমন্বিত প্রচেষ্টা। কতিপয় স্বনাম-ধন্য ব্যক্তিত্ব এ পরামর্শ দিয়েছেন যে, চরমপন্থীদের সাথে এ যুদ্ধ শেষ করতে ৩০ বা এমনকি ১০০বছরও লেগে যেতে পারে। ব্যক্তিগতভাবে আমি বিশ্বাস করি, এসব সামরিক এবং চরমপন্থী দলকে অনেক স্বল্পতর সময়ের মধ্যেই থামানো যেতে পারে, যদি বিশ্ব তাদেরকে প্রকৃতই নির্মূল

করার চিন্তা রাখে। আমরা অবশ্যই মনে করি না যে, এ যুদ্ধ শেষ করতে কয়েক দশক লেগে যেতে পারে একথা বলেই আমরা আমাদের দায়-দায়িত্বগুলো থেকে মুক্ত হয়ে যাবো, বরং বৈশ্বিক সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলা করতে আমাদের প্রত্যেককেই এর প্রচেষ্টায় যুক্ত হতে হবে।

কেবলমাত্র ইসলাম অথবা কোন বিশেষ দলের গায়ে এ দোষ চাপালেই সেটা আমাদেরকে যুদ্ধ থেকে রক্ষা অথবা আমাদের দায়িত্ব পালনের দায়বোধ থেকে আমাদেরকে ছাড় দেবে না। এভাবে সব দেশের শান্তিকামী মানুষেরই উচিত তাদের সরকারগুলোর ওপর চাপ সৃষ্টি করা এবং রাজনীতিবিদ ও অন্যান্য প্রভাবশালী সব ব্যক্তিদের অবশ্যই উচিত এর ওপর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা এবং নিজ নিজ ক্ষেত্রে সত্যিকার ন্যায়-বিচার সমুন্নত করে বিশ্বের শান্তি ধ্বংসের প্রচেষ্টায় পূর্ণভাবে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে বিশ্ব-শান্তির উন্নয়ন সাধন করা। আমরা যদি বিশ্বকে রক্ষা করতে চাই, তবে সমাজের প্রত্যেক স্তরে খাঁটি ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে হবে এবং যেসব দেশ সন্ত্রাস সংশ্লিষ্ট সেসব সমস্যা মোকাবিলা করছে, এক সুন্দর পদ্ধতিতে সেগুলোর সমাধান হওয়া উচিত, যাতে হতাশা অপসারিত হয়।

কোন দেশেরই সম্পদের ওপর ঈর্ষান্বিত লোভাতুর দৃষ্টি দেওয়া উচিত নয়, বরং একে অপরকে সাহায্য করার নীতি নির্ধারণ করা উচিত। কালক্ষেপণ না করে জরুরী ভিত্তিতে বিশ্বকে এটা অনুধাবন করতে হবে যে, এ বিশ্ব সৃষ্টিকর্তাকে ভুলে গেছে তাই বিশ্বকে অবশ্যই তাঁর দিকে ফিরতে হবে। এমনটি যখন হবে, কেবল তখনই সত্যিকার শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে এবং এটা ছাড়া শান্তির কোন নিশ্চয়তাই থাকতে পারে না। আরেকটি বিশ্ব-যুদ্ধের ভয়ঙ্কর পরিণতির সম্ভাবনা সম্পর্কে ইতোপূর্বে আমি অনেকবারই বলেছি এবং সম্ভবত: সেটা এমন এক সংঘাতের পরই সংঘটিত হবে। বিশ্ব যখন এটা অনুধাবন করতে পারবে যে, কেবল ব্যক্তিগত স্বার্থ ও আকাঙ্খা এবং কায়েমী স্বার্থগুলো চরিতার্থ করার জন্যে যেসব ন্যায়-নীতি বিবর্জিত পন্থা গ্রহণ করা হয়েছিলো সেগুলোর ফলাফল কতই না ধ্বংসাত্মক ! এমন একটি দুর্বিপাক আসার আগেই আমি এটা আশা করি এবং প্রার্থনা করি যে, বিশ্বের বোধোদয় ঘটুক। আমি আশা করি এবং প্রার্থনা করি যে, বিশ্ব এর সৃষ্টিকর্তাকে সনাক্ত করুক এবং তাঁকে গ্রহণ করতে এগিয়ে আসুক।

এসব কথা বলে আমি আপনাদের কাছ থেকে এখন বিদায় নিচ্ছি। আপনাদের সবাইকে অনেক-অনেক ধন্যবাদ।

জন্য লিখিত পরীক্ষায় বসেন। একহাজার প্রতিযোগীর মধ্যে মাত্র পনোরো জন নির্বাচিত হন। যার মধ্যে তাঁর নামও ছিল। তিনি বলেন এই সবকিছুই সম্ভব হয়েছে সৈয়্যদনা হুযুর আনোয়ারের দোয়ার কারণে। (আলফযল ইন্টারন্যশনাল ২৫ অক্টোবর ২০১৯, পৃষ্ঠাঃ ২০)

জার্মানির এক কিশোর এই কথা প্রকাশ করেন- তিনি বলেন, আমি আমার প্রিয় হুযুর আনোয়ারকে দোয়ার আবেদন করি যে আল্লাহ্ তাআলা আমার পরিবারকে যেন সব ধরনের সমস্যা থেকে দূরে রাখে আর কোনও প্রকার বিপদাবলী যেন আমার পরিবারের উপর না আসে। তিনি বলেন সে সময় আমার এক কাকা পাকিস্থানে একাকী থাকতেন, আর বাকী আত্মীয়-স্বজনরা সব বাইরে থাকতেন, চারিদিকে খুবই সমস্যা চলছিল। কাছে কোন পরিচিত কেউ না থাকার জন্য কাকা খুবই দুশ্চিন্তার মধ্যে ছিলেন। সেসময় আমি হুযুর আনোয়ারকে দোয়ার পত্র লিখলে সমস্ত পরিস্থিতি মুহুর্তেই বদলে যায়। কয়েকদিনের মধ্যেই কাকার জন্য নরওয়ে থেকে বিয়ের সম্বন্ধ আসে। রিশ্তাটি ঠিক হয়ে যায়। আর কাকা আল্লাহ্ তাআলার অনুগ্রহে নরওয়ে চলে আসেন। আর এখন সেখানে নিজের স্ত্রী-সন্তান পরিবার নিয়ে সুখের দিন যাপন করছেন। এটিই হল খিলাফতের কল্যান। যা প্রাণের আরাম ও প্রশান্তি বয়ে আনে।

কানাডার ডারহাম জামাতের এক মহিলা জনৈক এক মুরুব্বি সাহেবকে নিজের একটি ঘটনার কথা শোনান। এই ঘটনাটিও খুব চিত্রাকর্ষক। তিনি বলেন, কয়েক বছর পূর্বে আমাদের সাংসারিক জীবনে খুবই ঝড়-ঝাপ্টা আসে। আর নিজেদের মধ্যে এতটাই অশান্তি আরম্ভ হয়ে যায় যে আমি ঠিক করি এই মানুষটার সাথে আর থাকতে পারব না। এবার আলাদা হয়ে যেতে হবে। সেসময় হুযুর আনোয়ারের কানাডা সফর এসে যায়। হুযুর আনোয়ার এখানে আসেন আর আমি হুযুরের সাথে সাক্ষাতের জন্য আবেদন করি। যখন আমি সাক্ষাতে উপস্থিত হই, সমস্ত বৃত্তান্ত, পরিস্থিতি, সব খুলে বলি আর বাচ্চাদের জন্য দোয়ার আবেদন জানাই। সেই সাথে আমি আমার ফয়সালার বিষয়েও হুযুর আনোয়ারকে অবগত করি যে আমি পৃথক হয়ে যাওয়া ঠিক করেছি। হুযুর আনোয়ার জিজ্ঞাসা করেন, আপনার স্বামী এ বিষয়ে কি বলছেন? ঐ মহিলা বলেন, আমি বললাম যে তিনি তো মিটমাট করে নিতে চাইছেন, কিন্তু আমি যে আমার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেলেছি। আর কোন মিটমাট নয়, আর ফেরত যাওয়াও নয়। তখন হুযুর আনোয়ার বলেন, যদি তিনি মিটিয়ে নিতে চান তবে বিষয়টি মিটিয়ে নিন। ইনশাআল্লাহ্ সব ঠিক হয়ে যাবে। মহিলাটি বলে চলেন, এটা খুব অশ্চর্য যে আমি নিবেদন করেছিলাম যে আমি আমার ফয়সালা নিয়ে নিয়েছি, সব শেষ হয়ে গিয়েছে। অপরদিকে হুযুর আনোয়ার বললেন, 'না, সন্ধি করে নাও, সব ঠিক হয়ে যাবে। ইনশা আল্লাহ্'। মহিলাটি বলেন, এখন আমার কাছে এটি মান্য করা ছাড়া আর অন্য কোন উপায় ছিল না। সাক্ষাৎ পর্ব শেষ করে বাইরে এসে আমি নিজেই স্বামীকে ফোন করি এবং সব বিবাদ মিটিয়ে নিই। আল্লাহ্ তাআলা হুযুর আনোয়ারের এই শব্দগুলিকে আমার কাছে এমন স্বস্তিদায়ক করে দিয়েছিলেন আর সেগুলিকে এমন কল্যানমন্ডিত করে তুলেছিলেন যে বিবাদ মিটিয়ে নেওয়ার পর আমাদের জীবনে আমূল পরিবর্তন এসে যায়। আর এখন আমাদের দুজনের মধ্যে ভালবাসা ও বন্ধুত্বের এমন মেলবন্ধন সৃষ্টি হয়েছে যে মনে হচ্ছে যেন প্রতিদিনই আমাদের বিবাহ হচ্ছে। খিলাফতের আশিস থেকে বঞ্চিতরা যদি এই বিষয়টি অনুধাবন করত যে এমন মুহুর্তে তাদের বোঝানোর জন্য আর তাদ্ধর জন্য দোয়াকারী এবং তাদেরকে নিশ্চয়তা প্রদানকারী কেউ নেই। অন্যদিকে আহমদীদের কাছে তাদের মহান খলীফা আছেন যিনি স্বয়ং এক মহান আশীর্বাদের ন্যায় দন্ডায়মান। এটি হল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম খিলাফতেরই কল্যাণ আর প্রশান্তিলাভের মূল সোপানই হল এটি।

সম্মানীয় অতিথিবৃন্দ!

হুযুর আনোয়ার বিশ্বের বিভিন্ন প্রদেশের সংসদ ভবনে স্বয়ং উপস্থিত হয়ে ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর ও শান্তি প্রদায়ী শিক্ষামালা খুবই কার্যকরীভাবে তাদ্ধর সামনে তুলে ধরেছেন। এই কারণে তাঁকে 'শান্তির দূত' উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে। অগণিত মানুষ স্বীকার করেছেন যে হুযুর আনোয়ারের পবিত্র মুখ থেকে নিঃসারিত ইসলামের প্রশংসা তাদের হৃদয়কে আলোড়িত করেছে আর তাদের মানসপট ইসলামের অসাধারণ শিক্ষার আলোকে পূর্ণতা লাভ করেছে। একটি স্বীকারোক্তি তুলে ধরছিঃ

২০১২ সালে হুযুর আনোয়ার ব্রাসেল্স স্থিত ইউরোপীয় পার্লামেন্টে ভাষন প্রদান করেন। সে সময় জেনেভা (সুইৎজারল্যান্ড) থেকে হুযুর এর ভাষনে অংশগ্রহণ করার জন্য Bishop Dr Amen Howard এসেছিলেন। তিনি তাঁর মতামত ব্যক্ত যে ভাষায় করেছেন তা মন দিয়ে শোনার মতো। তিনি বলেন:

"এই ব্যক্তি কোন জাদুগর তো নন কিন্তু তাঁর ভাষায় জাদুর পরশ রয়েছে। ধীরস্থির অথচ তাঁর মুখ থেকে বের হওয়া শব্দগুলি অসাধারণ ক্ষমতা, বৈভব এবং প্রভাব নিজের মধ্যে ধারণ করেছে। এমন বলিষ্ঠ প্রতাপশালী ব্যাক্তিত্ব আমি আমার জীবনে কখনও দেখিনি। তাঁর মতো মানুষ যদি তিনজন এই পৃথিবী লাভ করে, তবে নাগরিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে অসাধারণ বিপ্লব মাসে নয় বরং কয়েকদিনেই তা সম্ভব হতে পারে আর এ বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তার আবাস স্থল হয়ে উঠতে পারে।" (আহ্মদীয়া গেজেট কানাডা, মে ২০১৮, পৃঃ-২০)

খিলাফতের মহান কল্যানরাজির মাত্র কয়েকটিই উপস্থাপন করা সম্ভব। খিলাফতের অপরিসীম নিয়ামতরাজির ধন্যবাদ জ্ঞাপন এবং নিরাপত্তার এই মহান বেষ্টনী থেকে কল্যানমান্ডিত হয়ে ওঠার জন্য আমাদের সাবইকে আপন আপন পরিধিতে শান্তির নিবাসস্থল তৈরী করতে হবে। হুযুর আনোয়ার তাঁর খুতবা এবং ভাষণে আমাদের সংঘবদ্ধ এবং ব্যক্তিগত উভয়স্তরেই আল্লাহ্ তাআলার অধিকার প্রদান, তাঁর সৃষ্টির অধিকারগুলিও যথাযথ আদায় করা, আল্লাহ্ তাআলার উপর ভরসা করার, দোয়ার প্রতি বিশেষ মনোযোগী হওয়া, হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালামের বয়াতের অঙ্গীকারগুলি নিষ্ঠার সাথে পূরণ করা, নিজেদের মধ্যে পবিত্র পরিবর্তন সাধন করা, পরিবারের সকলের সঙ্গে উত্তম আচরণ, পরবর্তি প্রজন্মের উত্তম উপায়ে লালন-পালন এবং প্রতিটি সৎ কাজের প্রতি বার বার দৃষ্টি আকর্ষণ করে চলেছেন। যদি আমরা সকলে আন্তরিক হৃদয়ে এ সকল উপদেশাবলীর উপর ন্যায়নিষ্ঠ হয়ে আমল করতে সচেষ্ট হই, তখন আল্লাহ্ তাআলা অবশ্যই আমাদের এ হেন প্রচেষ্টাকে দৃষ্টিপটে রেখে আমাদের কার্য সম্পাদনেরও সৌভাগ্য প্রদান করবেন। সেক্ষেত্রে সকলে আমরা নিজের নিজের পরিধিতে,আপন আপন পরিবারের কাছে প্রকৃত শান্তিরভূত হয়ে উঠতে পারব। আর যে নাগরিক সমাজ আপন আপন দায়িত্বকে অনুধাবন করে উত্তম চারিত্রিক উৎকর্ষতালাভ করবে নিঃসন্দেহে তারা সামাজিক শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা লাভ করে প্রকৃত বিপ্লব সাধনের ভিত্তি প্রমাণিত হবে। আর সেই পরিবেশ নিজেই নিরাপত্তার ভরকেন্দ্রে পরিণত হয় যেখানে বসবাসকারী প্রত্যেকে হিংস্র পশুদের অতর্কিত আক্রমণ থেকে সুরক্ষিত বলে মনে করা হয়।

আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সকলকে খিলাফতের এই অনন্ত অনুগ্রহের শুকরিয়া জ্ঞাপন এবং যুগ খলিফার প্রকৃত আনুগত্যকারী হয়ে ওঠার তৌফিক দান করুন। আমিন

ভাবানুবাদঃ খিলাফতের উপর আমরা যেন নিবেদিত প্রাণ হয়ে উঠতে পারি। এটি হল ঐশীভাবে মৃতদের জন্য সঞ্জীবনী সুধা স্বরূপ। হৃদয়ের অন্ধত্ব এর মাধ্যমে বিদূরিত হয়েছে। অমানিশায় এটিই হল হেদায়েত লাভের সঠিক দিশা। শান্তি, নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তা লাভের এটিই হল একমাত্র মাধ্যম। ঐশী রজ্জু হল সে সুরক্ষার মহা বেষ্টনী।

****

মহানবী (সা.)-এর বাণী

اَلصَّلٰوةُ عِمَادُ الدِّيْن

নামায ধর্মের স্তম্ভ।

দোয়াপ্রার্থী: Sk. Zakir Hossain Sb, District Amir, Bankura

যুগ ইমামের বাণী

বর্তমান যুগে দ্বীনের খেদমত এবং আল্লাহ্ তা'লার বাণীকে সমুন্নত করার উদ্দেশ্যে আধুনিক জ্ঞান অর্জন এবং যারপরনায় সাধনার প্রয়োজন। (মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৩)

দোয়াপ্রার্থী: Sabina Yasmin, Bilaspur (Chhattisgarh)

খিলাফতের আনুগত্য- সফলতার চাবিকাঠি

-সালানা জলসা, জার্মানি ২০১৮, বক্তা- মাওলানা হামিদ কাওসার সাহেব

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

(সূরা আন্ নিসা: ৬০)

অনুবাদ: "হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্‌র এবং এই মহান রসূলের এবং তোমাদের মাঝে যারা আদেশ দেওয়ার অধিকার রাখে তাদের।"

"নিষ্ঠা প্রদর্শনই খিলাফতের দাসদের বিধান, আনুগত্যের শর্তে খিলাফতের স্থায়ীত্ব।

বিশ্বাসী দলের ভালবাসার দাবী হল,আনুগত্য যেন হতে থাকে, খলীফার আদেশের।"

সম্মানিত সভাপতি সাহেব এবং প্রিয় শ্রোতাবৃন্দ! খাকসারের বক্তব্যের বিষয়, "খিলাফতের আনুগত্য- সফলতার চাবিকাঠি।"

প্রিয় শ্রোতা! আপনারা যে আয়াতটি শুনেছেন সেখানে আল্লাহ্ তা'লা মু'মিনদেরকে এই আদেশ দিয়েছেন যে, আল্লাহ্ তা'লার আনুগত্য কর এবং রসূলের আনুগত্য কর এবং নিজেদের উচ্চপদস্থদেরও। আর যে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করল, সে এক বড় সফলতা অর্জন করল। বক্তৃতার বিষয়- খিলাফতের আনুগত্য, সফলতার চাবিকাঠি" । কুরআনের বাক্যে যেভাবে বলা হয়েছে:

وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

(সূরা আল আহযাব:৭২)

আল্লাহ্ তা'লা মু'মিনদের মহান বিজয়, সফলতা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্যের সাথে শর্তযুক্ত করে দিয়েছেন। একজন মুসলমান, তার সম্পর্ক যে ফির্কার সাথেই হোক না কেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের কোন আদেশের অবাধ্যতা করা সত্ত্বেও সে জগতে সফলতা লাভের আশা করবে- এটি আদৌ সম্ভব নয়। এমনটি কখনও হতে পারে না। অতএব এ বিষয়ে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) বলেন: (আল্লাহ্ তা'লা বলেন) হে মুহাম্মদ (সা.)! যেহেতু আমরা তোমাকেও ছাড়ব না, তাই আমরা তোমার জাতিকেও ছাড়ব না। তারা ধর্মের সংশোধন ব্যতিরেকে জগতে কখনও উন্নতি করতে পারবে না। একথা ভাবা তাদের জন্য চরম ভুল হবে যে, আমরা ধর্ম ছাড়াই তাদেরকে উন্নতি দান করব এবং আল্লাহ্ তা'লা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, কারণ এতে তারা ধর্ম থেকে আরও বিচ্যুত হবে।

(তফসীরে কবীর, সূরা আয্ যোহা, নবম খণ্ড, পৃ. ৮৫)

বর্তমানে মুসলমানদের ৭২ ফির্কা আল্লাহ্ তা'লার আদেশাবলী এবং অনেক শিক্ষা পরিত্যাগ করেছে আর অবাধ্যতা ও নৈরাজ্যে অধপতিত হয়ে চলেছে। তাই তাদের আধ্যাত্মিক, ধর্মীয় , জাগতিক , চারিত্রিক ও নৈতিক অবস্থা করুণ থেকে করুণতর হচ্ছে। একটি গুরুত্বপূর্ণ আদেশ যেটিকে তারা অমান্য করেছে আর করে চলেছে তা হল কুরআন করিমের সূরা আলে ইমরানের আয়াত নম্বর ৮২ (বিরাশি) এবং সূরা আহযাবের আয়াত নম্বর ৮ (আট)-এ আল্লাহ্ তা'লা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মাধ্যমে মুসলমানদের কাছ থেকে একটি দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়েছিলেন অর্থাৎ যখনই তোমাদের কাছে কোন রসূল আগমন করবে এবং আমার সত্যায়ন করবে তখন তোমরা তাকে অস্বীকার করবে না বরং অবশ্যই তাকে সাহায্য করবে "লাতু'মিনুন্না বিহি ওয়া লাতানসুরুন্নাহু" অবশ্যই তার প্রতি ঈমান আনবে এবং তাকে সাহায্য করবে।

সুধী শ্রোতাবৃন্দ! আল্লাহ্ তা'লা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-কে চৌদ্দ শতাব্দীর শিরোভাগে মসীহ্ মাওউদ এবং মাহদীয়ে মাওউদ আর উম্মতি নবী ও রসূল হিসেবে প্রেরণ করেছেন। আর তিনি (আ.) আল্লাহ্ তা'লার আদেশে চতুর্দশ হিজরী সনের ষষ্ঠ বছর তথা ২০ রজব ১৩০৬ হিজরী মোতাবেক ২৩ মার্চ ১৮৮৯ সালে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ভিত্তি রাখেন আর মুসলমানদের বয়আতের মাধ্যমে জামা'তে আহমদীয়াতে দীক্ষা নেওয়ার প্রতি গুরুত্বারোপ করে বলেন:

"সত্যনিষ্ঠ হয়ে আমার কাছে আস, এতেই তোমাদের মঙ্গল, সর্বত্র হিংস্র-প্রাণী, আমি হলাম সুরক্ষা দূর্গ।"

সুধী শ্রোতাবৃন্দ! হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা.)ও বর্তমান যুগের মুসলমানদেরকে দাজ্জাল এবং ইয়া'জুজ মা'জুজের ফিতনার বিষয়ে অবগত করেছেন। এছাড়া মুসলিম ওলামাদের পথভ্রষ্ট হওয়ার এবং তাদের মাঝে ফিতনা ও নোংরামি সৃষ্টির বিষয়টিও জানিয়ে রেখেছেন। আর এই সাবধান বাণীও উচ্চারণ করেছেন- মুসলমান ৭৩ ভাগে ভাগ হবে। তিনি (সা.) বলেন:

"লা ইয়াবকা মিনাল ইসলামে ইল্লা ইসমুহ"(মিশকাত, কিতাবুল ইলম) "ইয়াকুনু ফি উম্মাতি ফাযাআতুন, ফাইয়াসিরুন্নাসু ইলা উলামাঈহিম, ফাইযা হুম কিরাদাতুন ওয়া খানাযির"(আদ দূররে মানসুর ফিত্তাবিল বিল মা'সূর) (আব্দুর রহমান ইবনে আবি আবাকার জালালুদ্দীন আস সুয়ূতী, বাব ১৬, নবম খণ্ড, পৃ. ১৯৪)

ইউশিকুল ইমামু আন তাদাঈ আলাইকুম কামা তুদাঈয়াল আকালাতু ইলা কাসআতিহা"

(সুনান আবু দাউদ, কিতাবুল মালাহিম)

ওয়াল্লাযি নাফসু মুহাম্মাদিন বিয়াদিহি! লাতাফতারিকান্না উম্মাতি আলা সালাসিন ওয়া সাবঈনা ফিরকাতান, ওয়াহিদাতান ফিলজান্নাতি ওয়া সানতানি ওয়া সাবউনা ফিন্নারি, ক্বিলা ইয়া রাসুলিল্লাহি! মান হুম? ক্বালা, আল জামাআতু"

(সুনান ইবনে মাজাহ, কিতাবুল ফিতান, বাবা ইফতিরাকুল উমাম)

হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) বলেন: "এমন এক যুগ আসবে যখন ইসলাম কেবল নামে অবশিষ্ট থাকবে, আমার উম্মতের ওপর এমন এক দুশ্চিন্তা এবং বিপর্যয়ের যুগ আসবে যখন লোকেরা পথনির্দেশ লাভের উদ্দেশ্যে নিজেদের ওলামাদের কাছে দৌড়ে যাবে আর গিয়ে দেখবে তারা বানর আর শূকরের ন্যায় হয়ে গেছে। ঐ সকল আলেমদের আচার-ব্যবহার চরম বিপর্যস্ত এবং লজ্জাকর হবে। এমন যুগে জগতের সকল জাতি মুসলমানদের ওপর এমনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়বে যেভাবে ক্ষুধার্ত ব্যক্তি তার খাবারের পাত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সাহাবারা জিজ্ঞেস করলেন, এটি কি এ কারণে হবে যে, সে যুগে মুসলমানদের সংখ্যা কমে যাবে? হুযূর (সা.) উত্তরে বললেন, সংখ্যায় তো মুসলমানরা অনেক হবে কিন্তু মুসলমানদের মর্যাদা হবে পানির ওপর ফেনার ন্যায় তথা আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে তাদের কোন মূল্য বা মূল্যায়ন হবে না।

সেই খোদা যার হাতে আমার প্রাণ, মুসলমান ৭৩ ফির্কায় বিভক্ত হয়ে যাবে ১টি জান্নাতি হবে আর ৭২টি আগুনের অধিবাসী হবে। প্রশ্ন করা হল, সেই জান্নাতি ফির্কা কোনটি হবে? রসূলে করীম (সা.) বললেন, সেটি হবে একটি জামা'ত।

সুধী শ্রোতা! হযরত মুহাম্মদ (সা.) জান্নাতি ফির্কার বিষয়ে বলেছিলেন যে, সেটি হবে একটি জামা'ত। আজ মুসলমানের মাঝে প্রত্যেক ফির্কা সেই জামা'ত হবার দাবী করে। অতএব সেই জান্নাতি ফির্কা কারা –এ সিদ্ধান্ত কে দিবেন? এর সিদ্ধান্তও রসূলে করীম (সা.) স্বয়ং দিয়েছেন। জামা'তের সংজ্ঞা জানার জন্য হুযূর (সা.)-এর শেখানো পদ্ধতি, বাজামা'ত নামাযের দিকে মনোযোগ দিতে হবে। এক মসজিদে যদি একশত নামাযি উপস্থিত হয় আর তাদের মধ্য থেকে ৯৫ জন যদি কাতারে দাঁড়িয়ে কাউকে ইমাম না বানিয়ে এককভাবে নামায পড়া শুরু করে, তাহলে তাদের নামায বাজামা'ত নামায বলে পরিগণিত হবে না। বাকি ৫ নামাযি যদি মসজিদের কোন এক পাশে নিজেদের মধ্য থেকে কাউকে ইমাম নিযুক্ত করে নামায আদায় করে তাহলে সেই ৫জনের নামায বাজামা'ত নামায বলে পরিগণিত হবে।

এই উপমা দ্বারা মুসলমানদের উপলব্ধি করা উচিৎ, হুযূর পাক (সা.) কোন্ জামা'তকে প্রকৃত জামা'ত বলে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। এমন জামা'ত যার ইমাম থাকবে, ইমাম মাহদী (আ.) থাকবে, যাকে আল্লাহ্ তা'লা ইমাম মনোনীত করবেন। আর সেই ইমাম মাহদী (আ.)-এর বিষয়ে হুযূর পাক (সা.) মুসলমানদেরকে দৃঢ় আদেশ দিয়েছিলেন:

' যখন তোমরা ইমাম মাহদী (আ.)-কে দেখবে তখন তার বয়আত করবে, যদি বরফের পাহাড় হামাগুড়ি দিয়েও যেতে হয় তবুও যাবে, তিনি আল্লাহ্‌র খলীফা আল মাহদী।'

(সুনান ইবনে মাজাহ, কিতাবুল ফিতান, বাব খুরুজুল মাহদী, হাদীস নং ৪০৮৪)

বর্তমান যুগে মুসলমানদের ধর্মীয় এবং জাগতিক উন্নতি তখনই লাভ হতে পারে, যখন তারা খলীফাতুল্লাহ হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর পরিপূর্ণ আনুগত্য করবে। হযরত মুহাম্মদ (সা.) এক সাহাবী হযরত হুযায়ফা (রা.)-এর প্রশ্নের উত্তরে প্রত্যেক যুগের মুসলমানদেরকে এই আদেশ দিয়েছিলেন যে, যখন মুসলমানদের মাঝে ফিতনা-ফাসাদ, রক্তারক্তি সীমাতিক্রম করবে তখন তোমাদের জন্য আবশ্যক হবে, "তালযামু জামাআতাল মুসলিমীনা ওয়া ইমামাহুম" তথা মুসলমানদের জামা'ত আর তাদের ইমামের হাতে বয়আত করে তার সাথে সংযুক্ত থাকবে। এরপর বলেন, "সুম্মা ইয়ানশাউ দুআতুয যালাল, ফাইন কানা লিল্লাহি ফিল আরযি খলীফাতুন, জালাদা জাহুরাকা ওয়া আখাযা মালাকা ফাআতি'হু" (মিশকাত, কিতাবুল ফিতান ও আবু দাউদ)

"এমন এক যুগ আসবে যখন পথভ্রষ্টতার দিকে আহ্বানকারী সৃষ্টি হবে। যদি পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কোন খলীফা থাকে আর সে যদি তোমাদের পিঠে চাবুকও মারে আর তোমাদের সম্পদও ছিনিয়ে নেয় তবুও তোমরা তার আনুগত্য করবে।"

বর্তমানে মুসলমানদের প্রায় সকল দেশ ফিতনা-ফাসাদ এবং উগ্রতার আগুনে জ্বলছে। কোথাও শান্তির ছিটেফোঁটা নেই। সিরিয়াকে ইয়া'জুজ-মা'জুজ আর দাজ্জালি অপশক্তি জ্বালিয়ে কয়লা বানিয়ে দিয়েছে। আফগানিস্তান এবং ইরাকের ভূমিকে এমনভাবে তুলোধুনো করেছে ঠিক যেভাবে তুলা ধুনা হয়। মিশর, লিবিয়া, ফিলিস্তিন এবং আরব উপদ্বীপগুলোকে ধ্বংস ও বরবাদ করে দেওয়া হয়েছে। ক্ষুধার জ্বালায় নিপীড়িত ইয়েমেনের লোকদেরকে ভয়ংকর আগ্নেয়াস্ত্রের মাধ্যমে ধোঁয়ার ন্যায় উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। ইসলামের শত্রুরা নিজেরাই উগ্রবাদী তৈরি করে আর তাদেরকে নিজেদের স্বার্থে ট্রেনিং দেয় আর অবশেষে উগ্রপন্থী নামে তাদেরকে ধ্বংস করে এবং ইসলাম ও মুসলমানদেরকে জগতের সামনে ভয়ংকর হিসেবে উপস্থাপন করে। হে মুসলমান! নিজেদের মাথায় এ বিষয়টি গেঁথে নিন, এই সকল বিপদাপদ ইসলামী খিলাফতের অনুগত্য না করার প্রতিফলন। আরও জেনে নিন, এই বিপদ থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় হল সেই ঢাল যাকে হযরত মুহাম্মদ (সা.) ঢাল বলে আখ্যা দিয়েছেন, তিনি (সা.) বলেন:

"ইমাম হল একপ্রকার ঢাল, তাঁর পেছনে থেকেই শত্রুর মোকাবিলা করা হয় আর শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।" আর এই হল সেই "উরওয়াতুল উসকা" যা সকল প্রকার সফলতার চাবিকাঠি।

এ বিষয়েই একবার হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) মর্মবেদনা নিয়ে বলেছিলেন:

"আমি মনে করি, এই পশ্চাৎপদতা এবং অধঃপতনের যুগ আর বারবার আগত এই বিপদাপদ প্রকৃতপক্ষে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে অস্বীকার করার কারণে আপতিত হচ্ছে। আমি তোমাদেরকে নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, বিষয়টি যতই শোচনীয় হয়ে থাকুক, যদি আজ তোমরা খোদা প্রতিষ্ঠিত নেতৃত্ব তথা খিলাফতের সামনে মাথা অবনত কর তাহলে কেবল জাগতিকভাবেই তোমরা মহান এক শক্তিতে

পরিণত হবে না বরং সমস্ত জগতে ইসলামের নব বিজয়ের এমন এক মহান আন্দোলন শুরু হবে, জাগতিক কোন শক্তি তার মোকাবিলা করতে সক্ষম হবে না। (খুতবা জুমু'আ, ১৩ আগষ্ট ১৯৯০, ইসলামাবাদ)

সুধী শ্রোতাবৃন্দ! হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন:

"খলীফা মূলতঃ রসূলের প্রতিচ্ছায়া। কোন মানুষ এ জগতে চিরস্থায়ী নয়। তাই খোদা তা'লা ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, রসূলদের সত্তা যা পৃথিবীর সকল সত্তার চেয়ে অধিক সম্মানিত ও পবিত্র, তা যেন প্রতিচ্ছায়ারূপে কিয়ামত পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত থাকে। তাই এ উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তা'লা খিলাফত মনোনীত করলেন যেন জগত কখনও কোন যুগে বরকত এবং রিসালাত থেকে বঞ্চিত না থাকে।"

(শাহাদাতুল কুরআন, রূহানী খাযায়েন, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩৫৩)

এমনইভাবে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা স্পষ্টভাবে বলেছেন,

"লাইয়াসতাখলিফান্নাহুম" তথা আল্লাহ্ তাদেরকে খলীফা বানিয়ে দিবেন। প্রত্যেক খলীফাকে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর বিশেষ তকদিরের মাধ্যমে খিলাফতের আসনে সমাসীন করেন আর প্রতিচ্ছায়ারূপে তাকে রসূলের গুণে গুণান্বিত করেন এবং তাকে স্বয়ং সাহায্য ও সহযোগিতা করেন।

সম্মানিত শ্রোতাবৃন্দ! আমাদের সৌভাগ্য, আমরা খিলাফতে খামেসার কল্যাণময় যুগ থেকে কল্যাণমণ্ডিত হচ্ছি। আমরা আমাদের এই সৌভাগ্যের কারণে যতই আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি– তা কম হবে। একটু আগেই আপনারা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বাণী শুনেছেন। "খলীফা মূলতঃ রসূলের প্রতিচ্ছায়া হয়ে থাকে"– এই বাণীর আলোকে আমাদের সবার জন্য আবশ্যক এবং ফরয, আমরা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেসের (আল্লাহ্ তাকে সাহায্য করুন) ঠিক সেভাবে আনুগত্য করব যেভাবে প্রাথমিক যুগে সাহাবারা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আনুগত্য করতেন এবং দ্বিতীয় যুগে সাহাবারা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর অনুগত্য করতেন। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, "ইন্নাল্লাহা আলিমুম বিযাতিস সুদূর" (সূরা আলে ইমরান: ১২০) আল্লাহ্ তা'লা হৃদয়ের অন্তঃস্থলে কি আছে তা খুব ভালভাবে জানেন।

এক হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ্ তা'লা বলেন: "আনা ইনদা যান্নি আবদি বি" (মুত্তাফাক আলাইহি, মিশকাত, বাব: যিকরুল্লাহি আয্যা ওয়া জাল ওয়া তাকাররুবু ইলাইহ্) আল্লাহ্ তা'লা বলেন, "আমার বান্দা আমার বিষয়ে যেরূপ ধারণা করে বা চিন্তা করে সেই অনুযায়ী আমি প্রতিফল প্রকাশ করে থাকি"। তাই প্রত্যেকের উচিত, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেসের সেই পরিপূর্ণ আনুগত্য এমন নিয়্যতের সাথে করা যেরূপ আনুগত্য করার আদেশ আল্লাহ্ তা'লা দান করেছেন। আর আল্লাহ্র কাছে দোয়া করা দরকার, আল্লাহ্ যেন আমাদেরকে হুযূরের পবিত্র আকাঙ্খা অনুযায়ী তাঁর প্রত্যেকটি আদেশ পালনের জ্ঞান ও সৌভাগ্য দান করেন। এ বিষয়টি একেবারে সুনিশ্চিত, সুফল-কুফল উভয় পরিণাম আল্লাহ্ তা'লাই প্রকাশ করে থাকেন। আর প্রত্যেকের হৃদয়ে যতটা আনুগত্য রয়েছে সে অনুযায়ী আল্লাহ্ সফলতা এবং মহান বিজয় দান করবেন।

হযরত মুহাম্মদ (সা.) এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পবিত্র যুগে হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত মাওলানা নুরুদ্দীন সাহেব (রা.)-এর আনুগত্যের মান অনুযায়ী আল্লাহ্ তা'লা তাঁদেরকে মহান মর্যাদা দান করেছিলেন। মুনাফেক আর লাহোরীরাও বাহ্যত আনুগত্য করত। কিন্তু তাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'লার ব্যবহার হয়েছে তাদের হৃদয়ে আনুগত্যের যে মান ছিল সে অনুযায়ী। এ রহস্য খুব ভালভাবে আমাদের মস্তিষ্কে গেঁথে নেওয়া আবশ্যক। যদি আমাদের আনুগত্য কেবল আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই হয় তাহলে অগণিত প্রতিদান এবং পুণ্যের পাশাপাশি এ জগতেও আল্লাহ্ সেই সফলতা আমাদেরকে দান করবেন যা আমরা কল্পনাও করতে পারি না। আনুগত্যের বিষয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) জামা'তের সদস্যদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন:

"আনুগত্য কোন সাধারণ বিষয় নয় আর সহজও নয়। আনুগত্য হল এক প্রকার মৃত্যু। এক জীবিত ব্যক্তির চামড়া তুলে নেওয়া যেমন; আনুগত্য ঠিক তেমনই।"

(আল হাকাম, ৩১ অক্টোবর ১৯০২, পৃ. ১০)

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) "খিলাফতের আনুগত্য– সফলতার চাবিকাঠি"– প্রসঙ্গে বলেন: "খিলাফতের আনুগত্য হল, খলীফার মুখে কোন বিষয় উচ্চারিত হলে তৎক্ষণাৎ সকল স্কীম, সকল বিবেচনা আর সকল বিষয় পরিত্যাগ করে মনে করা উচিত এখন এই স্কীম, এই বিচার-বিবেচনা এবং সেই প্রচেষ্টা কল্যাণকর যেটি যুগ-খলীফার পক্ষ থেকে আদেশ লাভ হয়েছে। যতদিন পর্যন্ত এই স্পৃহা জামা'তের মাঝে সৃষ্টি না হবে, ততদিন পর্যন্ত সকল খুতবা বেকার, সকল স্কীম এবং সকল চেষ্টা-প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে।"

(আল ফযল, ৩১ জানুয়ারি ১৯৩৬ সাল, পৃ. ৯)

সম্মানিত শ্রোতাবৃন্দ! আনুগত্য তা কুদরতে উলা হোক বা কুদরতে সানিয়ার বহিঃপ্রকাশ, এর পরিণামে সফলতা এবং বিজয় জাতীয় ও ব্যক্তিপর্যায়েও লাভ হয় আর অবাধ্যতার দুঃখ-কষ্ট অনেক সময় অনেক লোককে ভোগ করতে হয়। এই রহস্য আল্লাহ্ তা'লা ইসলামের প্রাথমিক যুগেই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। আর এ বিষয়টির উল্লেখ কুরআন করীমেও করে দিয়েছেন যেন কিয়ামত পর্যন্ত প্রত্যেক যুগে মুসলমান আনুগত্য এবং অবাধ্যতার পরিণাম উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়।

মহানবী (সা.) মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় অবস্থানের কেবল ১৩ মাস অতিক্রান্ত হয়েছে তখন মক্কার কুরায়শ মদীনার ওপর আক্রমণ করল এবং মুসলমানদেরকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র করল। আবু সুফিয়ানের তত্ত্বাবধানে কাফেরদের একটি ব্যবসায়িক কাফেলা সিরিয়া থেকে ব্যবসা শেষে মক্কা ফেরত যাচ্ছিল আর তাদের পথ ছিল মদীনার অনতিদূরে। মক্কাবাসীরা সেই কাফেলার সুরক্ষার অজুহাতে এক শক্তিশালী সেনাদল মদীনার দিকে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। রসূলে করীম (সা.) পূর্বেই ঘটনা জেনে গেলেন। আর খোদা তা'লার পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি ওহী হল যে, এখন সময় এসেছে, শত্রুর অত্যাচারের প্রতিবাদ তাদের ন্যায় অস্ত্রের মাধ্যমেই দেওয়া হোক। হুযূর (সা.) উক্ত উদ্দেশ্যে মদীনা থেকে ৩১৩জন সাহাবীকে নিয়ে রওনা দিলেন। তিনি (সা.) যখন মদীনা থেকে বের হলেন তখনও সিদ্ধান্ত হয় নি যে, যুদ্ধ ব্যবসায়ী দলের সাথে হবে নাকি মূল সেনাদলের সাথে হবে। কুরআন করীম থেকে জানা যায়, ঐশী ইচ্ছা এটিই ছিল যে, কাফেলার সাথে নয় বরং মূল সেনাদলের সাথেই যুদ্ধ হবে। তিনি (সা.) সাহাবাদেরকে একত্রিত করলেন আর তাদের উদ্দেশ্যে বললেন, এখন কাফেলার কোন প্রশ্ন নেই, কেবল সেনাদলের সাথেই মোকাবিলা করা যেতে পারে আপনাদের কী মত? একের পর এক মুহাজের সাহাবী দাঁড়ালেন আর তারা বললেন, হে আল্লাহ্র রসূল! যদি শত্রু আমাদের ঘরের ওপরও চড়াও হয় তবুও আমরা তাদেরকে ভয় পাই না, আমরা তাদের সাথে মোকাবিলা করতে প্রস্তুত।

হুযূর (সা.) প্রত্যেক মুহাজেরের বক্তব্য শুনে বলতে থাকলেন, আমাকে আরও পরামর্শ দাও আমাকে আরও পরামর্শ দাও। মদীনার আনসাররা তখনও নীরব ছিল। তখন এক আনসার সরদার মিকদাদ বিন আসওয়াদ এবং সাঈদ বিন মাআয যারা আওস গোত্রের নেতা ছিলেন, তারা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর আকাঙ্খা উপলব্ধি করতে পারলেন এবং আনুগত্যের উত্তম আদর্শ উপস্থাপন করে বললেন: হে আল্লাহ্র নবী! আপনাকে তো পরামর্শ দেওয়াই হচ্ছে, তবুও আপনি বারবার পরামর্শ দিতে বলছেন। সম্ভবত আপনি আনসারদের পরামর্শ নিতে চাচ্ছেন। তিনি (সা.) বললেন, হ্যাঁ। সেই সরদার সাহেব উত্তরে বললেন, হে আল্লাহ্র রসূল! সম্ভবত আপনি এ কারণে আমাদের পরামর্শ চাচ্ছেন যে, আপনার মদীনায় আগমনের পূর্বে আপনার আর আমাদের মাঝে একটি চুক্তি হয়েছে আর চুক্তিতে বলা হয়েছিল, যদি মদীনায় অবস্থানকালীন কেউ আপনার ওপর অথবা মুহাজেরদের ওপর আক্রমণ করে তাহলে আমরা আপনার এবং মুহাজেরদের সুরক্ষা করব। কিন্তু এ মুহূর্তে আপনি মদীনার বাইরে এসেছেন। যখন সেই চুক্তি করা হয়েছিল তখন আপনার মর্যাদা আমাদের কাছে স্পষ্ট ছিল না। এখন যখন আমাদের জন্য আপনার মর্যাদা ও সম্মান পুরোপুরি স্পষ্ট হয়েছে তখন হে আল্লাহ্র রসূল! এখন আর সেই চুক্তির কোন প্রশ্নই ওঠে না। আমরা মূসার জাতির ন্যায় আপনাকে এ কথা বলব না যে, "ফাযহাব আনতা ওয়া রাব্বুকা, ফাকাতিলা, ইন্না হাহুনা কাঈদূন" (সূরা আল মায়েদা: ২৫) অর্থাৎ তুমি এবং তোমার প্রভু যাও এবং শত্রুর সাথে যুদ্ধ কর- আমরা এখানে বসে থাকি, বরং আমরা আপনার ডানে লড়ব, আপনার বামে লড়ব, আপনার সামনে লড়ব আর আপনার পেছনেও লড়ব। হে আল্লাহ্র রসূল! যে শত্রুরা আপনাকে ক্ষতি করতে এসেছে, তারা আপনার কাছে ততক্ষণ পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের লাশের ওপর দিয়ে না যায়। হে আল্লাহ্র রসূল! যুদ্ধ তো এক সাধারণ বিষয়। এখান থেকে কিছু দূরে সমুদ্র। আপনি আমাদেরকে সমুদ্রে ঘোড়াসহ ঝাঁপ দিতে বলুন, আমরা তাই করব।

এরপর ১৭ রমযান দ্বিতীয় হিজরী সনে তথা ১৪ মার্চ ৬২৪ সালে বদর প্রান্তরে মক্কার কাফের সৈন্য এবং মুসলমানদের মাঝে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়। কয়েক ঘণ্টার এ যুদ্ধেই মুসলমানদের বিজয় হয় এবং মক্কার কাফেররা পরাজিত হওয়ার পাশাপাশি বহু প্রাণ হারায়। এ বিজয়ের আরও অনেক কারণ রয়েছে তবে তার মাঝে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল সাহাবায়ে কেরামের পরিপূর্ণ আনুগত্যের বহিঃপ্রকাশ।

পরবর্তী বছর তথা ৭ শাওয়াল তৃতীয় হিজরী মোতাবেক ২৩ মার্চ ৬২৫ সালে অপর একটি যুদ্ধ সংঘটিত হয় যাকে ওহুদের যুদ্ধ বলা হয়। এবারের যুদ্ধ মদীনার কাছে ওহুদ পাহাড়ের পাদদেশে সংঘটিত হয়। ওহুদ পাহাড়ে একটি গিরিপথ ছিল যেখান দিয়ে শত্রুর আক্রমণ হওয়ার আশংকা ছিল। হুযূর (সা.) সেই গিরিপথের সুরক্ষার জন্য আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের (রা.)-এর তত্ত্বাবধানে ৫০ জন তিরন্দাজের একটি দলকে নিযুক্ত করেন এবং তাদেরকে উপদেশ দিয়ে বলেন, যদি আমাদের বিজয় হয় আর শত্রু পিছপা হয়ে পলায়ন করে, তবুও তোমরা এই গিরিপথ পরিত্যাগ করবে না। আর যদি তোমরা দেখ মুসলমানদের পরাজয় হয়েছে এবং শত্রু বিজয়ী হয়েছে তবুও তোমরা এই গিরিপথ পরিত্যাগ করবে না। যুদ্ধ শুরু হল এবং অল্প কিছু সময়ের ভিতর মুসলমানদের বিজয় লাভ হল। যখন গিরিপথে যারা পাহারারত ছিল, তারা দেখল বিজয় সম্পন্ন হয়েছে, তখন তাদের মধ্য থেকে কেবল চার-পাঁচজন ছাড়া সকলেই গিরিপথ পরিত্যাগ করে নিচে চলে আসল। তাদের আমীর তাদেরকে রসূলে করীম (সা.)-এর কঠোর আদেশ স্মরণ করালেন কিন্তু তারা উত্তরে বললেন যে, হুযূর (সা.)-এর বক্তব্যের উদ্দেশ্য ছিল, যদি বিজয় সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিশ্চিত না হও তবে গিরিপথ ছাড়বে না। এখন তো বিজয় লাভ হয়ে গেছে, তাই গিরিপথ খালি রাখলে কোন সমস্যা নেই।

খালেদ বিন ওয়ালিদ তখন কাফেরদের পক্ষ থেকে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল, যখন দেখল যে, গিরিপথ খালি হয়ে গেছে, তখন কাফেরদের পলায়নপর যোদ্ধাদেরকে একত্রিত করে গিরিপথের দিক দিয়ে ভয়ানক আক্রমণ চালাল, ফলে মুসলমানদের বিজয় পরাজয়ে পর্যবসিত হল এবং মুসলমানের অনেক প্রাণের ক্ষতি হল, সম্পদের ক্ষতি হল এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) প্রচণ্ডভাবে আহত হলেন।

সুধী শ্রোতাবৃন্দ! ইতিহাসের এই ঘটনাটির দিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত এবং এখান থেকে শিক্ষা নেওয়াও আবশ্যক। গিরিপথে যাদেরকে দায়িত্ব দিয়ে হুযূর (সা.) নিযুক্ত করেছিলেন তারা হুযূর (সা.)-

এর আদেশ নিজেদের স্বার্থ ও ইচ্ছা অনুযায়ী ব্যাখ্যা করে বসলেন। তাদের এই ভুল ব্যাখ্যার কারণে মুসলমানদের বিজয় পরাজয়ে পর্যবসিত হয়ে গেল।

এই ঘটনায় আমাদের জন্য শিক্ষা হল, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল-খামেস (আই.) যে আদেশ দিবেন তা ঠিক সেভাবে মান্য করতে হবে যেভাবে তিনি আদেশ দেন আর তাতে পরিপূর্ণভাবে আমল করুন, নিজের মর্জি এবং আকাঙ্খা অনুযায়ী সেই আদেশ অথবা হেদায়েতের অর্থ বের করবেন না। অন্যথায় আল্লাহ্ যিনি অন্তর্যামী, তিনি সেই অনুযায়ী হিসেব নিবেন এবং পরিণাম প্রকাশ করবেন।

সুধী শ্রোতাবৃন্দ! বর্তমান যুগে ইসলামের বিরোধীরা কুরআনের শিক্ষাকে তাদের আপত্তির লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করছে এবং তারা এটি প্রমাণ করার চেষ্টা করছে, বর্তমান উন্নত যুগে ইসলামী শিক্ষা আমলের অযোগ্য। এর কারণ হল, অধিকাংশ মুসলমান ইসলামী শিক্ষার ওপর সঠিক অর্থে আমল করছেন না যেমন এই ব্যস্ততার যুগে পাঁচ বেলার নামায আদায় করা সম্ভব নয়, মুসলমান মহিলাদের জন্য কুরআন করিমে পর্দার যে আদেশ দেওয়া হয়েছে, অমুসলমানদের কাছে সেটিও আমলযোগ্য নয়। সুদের বিষয়েও কুরআনে যে শিক্ষা রয়েছে, তা-ও আমলযোগ্য নয়, তাই মুসলমানদের অধিকাংশ সুদের কারবারে লিপ্ত। এগুলো ছাড়াও আরও অনেক ক্রিয়া-কর্ম আমলযোগ্য নয়– এই হল তাদের ভাষ্য।এ যুগে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল-খামেস (আই.) তাঁর খুতবা এবং বক্তৃতায় জামা'তের সদস্যদেরকে নিজেদের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক অবস্থা উন্নত থেকে উন্নততর করার আদেশ দিচ্ছেন। আর কুরআনী শিক্ষার ওপর আমল করার বারবার নসীহত করছেন। এই নসীহত এবং আদেশ সেই হুকুম ও আদেশের অনুরূপ যা রসূলে করীম (সা.) গিরিপথে দণ্ডায়মান সাহাবীদের উদ্দেশ্য দিয়েছিলেন।

মোটকথা এ মুহূর্তে ২১০ (বর্তমানে ২১৬) দেশে আহমদীরা এমন গিরিপথে মোতায়েন আছে যেখানে কুরআনের শিক্ষার ওপর যথাসাধ্য আমল করে ইসলামের বিরোধীদেরকে এটি প্রমাণ করে দেখাতে হবে যে, কুরআনের শিক্ষা যেভাবে পূর্বেও আমলযোগ্য ছিল, আজও ঠিক সেভাবে পালন করা সম্ভব। আর ঐ শিক্ষার ওপর আমল করাই প্রত্যেক মানুষের ইহকাল ও পরকাল সুসজ্জিত করার জন্য আবশ্যক।আমাদের আহমদীয়াতের তথা প্রকৃত ইসলামের আধ্যাত্মিক বিজয় লাভের জন্য হুযূর (আই.)-এর হেদায়াতের ওপর যথাসাধ্য আমল করা আবশ্যক আর নিজের পক্ষ থেকে কোনরূপ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা উচিত নয়।

সুধী শ্রোতা! খিলাফতের আনুগত্য হল, সফলতার চাবিকাঠি –এই ধারাবাহিকতায় আরও একটি ঈমান উদ্দীপক ঘটনা উপস্থাপন করছি।

১৯৪৭ সালে পাক-ভারত বিভক্ত হয়। পঞ্চনদীর পাঞ্জাব দুই অংশে ভাগ হয়ে যায়। পূর্ব-পাঞ্জাব হিন্দুস্তানের অংশে আসে আর পশ্চিম-পাঞ্জাব পাকিস্তানের অংশে যায়। এই রক্তক্ষয়ী বিভাজনের ফলে উভয় দিকে লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। এক হিসেব অনুযায়ী পূর্বপাঞ্জাবে কুড়ি থেকে পঁচিশ লাখ মুসলমানকে হত্যা করানো হয়েছে। লক্ষ লক্ষ শিশু অনাথ হয়েছে, অনেক মুসলমান নিজ বৃদ্ধ পিতা মাতাকে আশ্রয় শিবিরে ফেলে রেখে পালিয়ে গেছে, আর সেখানে তারা দীর্ঘশ্বাস নিতে নিতে মারা গেছে। হাজার হাজার মুসলমান মহিলাকে ফাসাদকারীরা এবং তাদের সেনাদল তুলে নিয়ে গিয়েছে, মুসলমানদের প্রায় সকল মসজিদ, কবর, খানকা ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। দেশ বিভাগের প্রথম বছর পূর্বপাঞ্জাবের দু- একটি বাড়ি ছাড়া কোথাও মুসলমান দেখা যেত না। এই ঘটনা ঘটার বহু পূর্বে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) বিষয়টি আঁচ করতে পেরেছিলেন। আর এর কুফল থেকে রক্ষা লাভের লক্ষ্যে প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছিলেন। পূর্বপ্রস্তুতিস্বরূপ যারা সেনাবাহিনীতে চাকুরি করে এমন আহমদীদেরকে তাহরিক করেন, তারা যেন চাকুরি থেকে ইস্তফা দিয়ে দ্রুত কেন্দ্র সুরক্ষার লক্ষ্যে কাদিয়ান চলে আসে। এই আদেশের কারণে হাজার হাজার আহমদী সেনা আনুগত্যের উত্তম আদর্শ উপস্থাপন করেন এবং চাকুরিকে বিদায় জানিয়ে কাদিয়ান পৌঁছে যান। তাদের মধ্য থেকে অনেক আহমদী সেনাকে তাদের অফিসার বুঝিয়েছেন যে, তোমাদের চাকুরির মেয়াদ পূর্ণ হতে আর মাত্র এক মাস বাকি আছে, এই একমাস থেকে যাও তাহলে পেনশন এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা পেয়ে যাবে। আহমদীরা উত্তরে বললেন, আমরা একদিনের জন্যও থাকতে পারব না, আমাদের ইস্তফা মঞ্জুর করুন বা না করুন, আমরা কাদিয়ান চলে যাচ্ছি। সেনারা ছাড়াও অনেক আহমদী স্বেচ্ছাসেবী সেবার উদ্দেশ্যে কাদিয়ান পৌঁছে গেল।

দেশ বিভাগের সেই বিভীষিকাময় দিনগুলোতে যে সেবা তারা দান করেছেন, তার বিস্তারিত বর্ণনা এ মুহূর্তে উল্লেখ করার সুযোগ নেই, কেবল এতটুকু বলা আবশ্যক যে, হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) ৩১ আগষ্ট ১৯৪৭ কাদিয়ান থেকে হিজরত করে লাহোর চলে যান আর তিনি তার একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণীতে বলেন, হে বন্ধুগণ! আহমদীয়াতের পরীক্ষার সময় আগত। তখন বোঝা যাবে কে সত্যিকার মু'মিন। তাই নিজেদের ঈমানের এমন দৃষ্টান্ত উপস্থাপন কর যেন পূর্ববর্তী জাতির মাথা তোমাদের সম্মুখে অবনত হয় এবং পরবর্তীরা তোমাদের কীর্তি স্মরণ করে গর্ব করতে পারে।

(আল ফযল, ৮ জুন ১৯৪৮)

যারা দরবেশ বলে পরিচিত আর অন্যান্য আহমদী স্বেচ্ছাসেবীদেরকে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) যে হেদায়েত দান করেছিলেন, তার মাঝ থেকে কয়েকটি উল্লেখ করছি।

* পবিত্র স্থানসমূহ এবং আল্লাহ্ তা'লার নিদর্শনসম্বলিত জায়গাগুলোকে কোন অবস্থায় পরিত্যাগ করবে না, এগুলো সুরক্ষার জন্য যত কুরবানী দিতে হয়, তোমরা তা দিবে।

* মিনারাতুল মসীহ্ থেকে আযানের ধারাবাহিকতা বন্ধ যেন না হয়।

* বেহেশতি মাকবেরা এবং পবিত্র মাযারসমূহে নিয়মিত গিয়ে এককভাবে এবং সম্মিলিতভাবে দোয়া করবে।

* মসজিদে আকসা এবং মসজিদে মোবারকে বাজামা'ত নামায যেন হয় এবং তাহাজ্জুদ আর দোয়া করার ধারা অব্যাহত রাখা আবশ্যক।

* অবস্থা যেমনই হোক, যেকোন অবস্থায় তবলীগের সিলসিলা জারি রাখতে হবে।

* (যে দিনগুলোতে হত্যা, লুটপাট চরম পর্যায়ে ছিল, তখন খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) বলেন,) সকল আহমদী মহিলার সুরক্ষার পরিপূর্ণ ব্যবস্থা যেন নেওয়া হয়। দরবেশগণ হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.)-এর প্রত্যেকটি আদেশের যথাসাধ্য পালন করেছেন এবং নিজেদের সেই অঙ্গীকার পালন করেছেন এবং আনুগত্যের উত্তম আদর্শ উপস্থাপন করেছেন। দীর্ঘদিন অশেষ কষ্ট সহ্য করেছেন কিন্তু দৃঢ়তায় কোনরূপ চিড় ধরে নি। এ বিষয়ে অনেকগুলো ঘটনা আছে, তার মাঝ থেকে একটি উল্লেখ করছি।

১৯৪৭ সালের নৈরাজ্যপূর্ণ যুগে কাদিয়ানের মসজিদে আকসার পশ্চিম দিকে এক বাড়িতে ৪০ জন মহিলা আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাদের সুরক্ষার জন্য তাদেরকে মসজিদে আকসাতে আনা আবশ্যক ছিল। বাইরে কারফিউ চলছিল। মসজিদের পশ্চিম দেওয়াল আর বাড়ির মাঝে প্রায় ৭-৮ফিট চওড়া গলি ছিল। দুই যুবক গোলাম মোহাম্মদ সাহেব এবং মিস্ত্রি গোলাম কাদের সাহেব মসজিদের পশ্চিম দেওয়াল এবং বাড়ীর দেওয়ালের ওপর পাটাতন দিয়ে একজন করে মহিলাকে মসজিদে আনতে লাগলেন। ৩৯ জন মহিলা মসজিদে পৌঁছে গেল এবং ৪০তম মহিলাকে আনা হচ্ছিল, যখন সে মসজিদে পৌঁছে গেল, তখন সেনাদের নজর পড়ল সেই দুই যুবকের দিকে। তারা সেই দুই যুবকের দিতে তাক করে গুলিবর্ষণ শুরু করল এবং তাদেরকে শহীদ করে দিল। সেই দুই যুবক নিজেদের জীবন ঝুঁকিতে ফেলে কোন মহিলার অসম্মান হতে দেন নি। যখন হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) উভয় যুবকের শাহাদাতের ঘটনা শুনে বললেন, "এই দুই বাহাদুর আর হাজার লোক এ মুহূর্তে পৃথিবীতে শায়িত কিন্তু তারা নিজেদের জাতির সম্মান সুরক্ষা করেছেন। মোটকথা সবাইকে মরতে হয়। যদি অন্য কোনভাবে মারা যেতেন তাহলে তাদেরকে কেউ স্মরণ রাখতো না। খোদা তা'লার রহমত তাদের ওপর বর্ষিত হোক আর তাদের উত্তম আদর্শ মুসলমানের রক্তকে সর্বদা উজ্জীবিত করতে থাকুক।"
(আল ফযল, ১১ অক্টোবর ১৯৪৭, তারীখে আহমদীয়াত, একাদশতম খণ্ড, পৃ. ১৯০)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর আদেশ স্বচ্ছহৃদয়ে আমল করা এবং পরিপূর্ণ আনুগত্যের ফলে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর দরবেশদেরকে নিজেদের উদ্দেশ্য লাভে সফলতা দান করেছেন। আর আলহামদুলিল্লাহ্ খিলাফতে আহমদীয়ার ছত্রছায়ায় পবিত্র স্থানসমূহ আবাদ রয়েছে। মিনারাতুল মসীহ্ এবং অন্যান্য জায়গা থেকে আযানের ধ্বনি উচ্চারিত হয় আর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মাজারে প্রতিদিন মানুষের দোয়া করার ধারা অব্যাহত আছে, আলহামদুলিল্লাহ।

আহমদীয়াতের বিরোধীরা খিলাফতের আনুগত্যের ফলে অর্জিত সফলতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। মোটকথা সে যুগে ২৬ মে ১৯৪৮ সালে আজাদ নামে আহরারীদের এক পত্রিকা নিজেদের মোল্লা-মৌলবীদেরকে ভর্ৎসনা করে এবং কাদিয়ানে অবস্থানরত দরবেশদের প্রশংসা করতে গিয়ে লিখেছে,

"পূর্ব-পাকিস্তানের সাধারণ জনগণ তো জনগণই ছিল। যদি তারা পুলিশ এবং সেনাদল আর মানুষের ভয়ে হিজরত করে থেকে থাকে তা দ্বারা প্রতীয়মান হয় না যে, তারা বাধ্য ছিল। কিন্তু মসজিদের গাধা ইমামরা, খানকার সেবকরা এবং গদ্দিনশীন পীরেরা পলায়ন করেছে, তারা ইসলামের স্পৃহা এবং ইতিহাসের উল্টোপথে বিচরণকারী। সারাজীবন বসে বসে খেয়ে নিজেদের স্মৃতিচিহ্ন কাফেরদের হাতে সোপর্দ করা এবং নিজেরা পলায়ন করা সত্যিই লজ্জাকর। আজও মির্যা গোলাম আহমদের কবরের সুরক্ষার জন্য জীবন উৎসর্গকারী মির্যায়ী সেখানে উপস্থিত রয়েছে আর এখনও সেখানের মসজিদে আযান দেওয়া হয়।

সুধী শ্রোতাবৃন্দ! বিরোধীদের এই স্বীকারোক্তিতে সেই উপমা দেওয়া যেতে পারে, "আল ফাযলু মা শাহিদাত বিহিল আ'দাউ"।

একবার হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) নিজ জামা'তের আনুগত্যের প্রেরণার দৃষ্টান্ত বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, খোদা তা'লা আমাকে এমন সব তরবারি দান করেছেন যারা কুফরকে এক নিমিষে কেটে কেটে টুকরো করে দেয়, খোদা তা'লা আমাকে এমনসব হৃদয় দান করেছেন যারা সকল প্রকার কুরবানী করতে প্রস্তুত। আমি তাদেরকে গভীর সমুদ্রে লাফ দিতে বললে তারা তা-ই করতে প্রস্তুত। আমি তাদেরকে পাহাড়ের চূড়া থেকে লাফ দিতে বললে তারা তা-ও করতে প্রস্তুত। আমি তাদেরকে জ্বলন্ত চুল্লিতে ঝাঁপ দিতে বললে, তারা সেথায় ঝাঁপ দিতে প্রস্তুত। যদি আত্মহত্যা ইসলামে অবৈধ না হত, তাহলে এ মুহূর্তে আমি তোমাদেরকে এই নিদর্শন দেখাতে পারতাম। জামা'তে আহমদীয়ার একশত ব্যক্তিকে আমি নিজ পেটে ছুরি মেরে নিহত হওয়ার আদেশ দিলে এখনই তারা নিজেদের পেটে ছুরি মেরে মরতে প্রস্তুত। খোদা আমাদেরকে ইসলামের সেবায় দণ্ডায়মান করেছেন। খোদা আমাদেরকে মুহাম্মদ (সা.)-এর নাম সুউচ্চ করার জন্য দাঁড় করিয়েছেন।

(আল ফযল, মুসলেহ মাওউদ, নং ১৮, ফেব্রুয়ারি ১৯৫৮, পৃ. ১৭-১৮)

সুধী শ্রোতা! আল্লাহ্ তা'লা খিলাফতের আনুগত্যের বিষয়টি বোঝাতে গিয়ে পবিত্র কুরআনে আদেশ দিয়ে বলেন, "ফালা তামুতুন্না ইল্লা ওয়া আনতুম মুসলিমূন"

(সূরা আল্ বাকারা: ১৩৩)

পূর্ণ আনুগত্যকারী না হয়ে তোমরা মৃত্যুবরণ কর না। এই আয়াতের অনেক তফসীর আছে, যেগুলোর মধ্য থেকে একটি

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly

BADAR

Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023 -2025 Vol-8 Thursday, 18-25 May, 2023 Issue No.20-21

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

হল, প্রকৃত মুসলমান সে-ই, যার ওপর মৃত্যুর সময় আগত হলে তার অবস্থা এমন যেন হয়, সে পরিপূর্ণ আনুগত্যকারী। উপমাস্বরূপ বলা যেতে পারে, হুযূর আনোয়ার (আই.) কোন আদেশ দিলেন আর কেউ মনে করল, আগামীকাল বা দুই দিন পর করে ফেলব, এর পরমুহূর্তে যদি তার মৃত্যু হয় তাহলে তার উক্ত আনুগত্য লাভ হল না। বরং আদেশের বরখেলাফ হল। হযরত নুরুদ্দীন (রা.)-এর রহস্যকে খুব সুন্দরভাবে উপলব্ধি করেছেন এবং এ অনুযায়ী আমল করে দেখিয়েছেন। এ বিষয়ে কেবল একটি ঘটনা উপস্থাপন করছি।

১৯০৫ সালের অক্টোবর মাসে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিল্লীতে অবস্থান করছিলেন আর মাওলানা নুরুদ্দীন সাহেব (রা.) ছিলেন কাদিয়ানে। দিল্লী থেকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) টেলিগ্রামের মাধ্যমে জানালেন, দ্রুত দিল্লী চলে আসুন। যখন তিনি (রা.) টেলিগ্রাম পেলেন তখন তিনি ডিস্পেন্সারীতে বসে ছিলেন, তৎক্ষনাৎ উঠে দাঁড়ালেন আর বললেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) অনতিবিলম্বে যেতে বলেছেন। ঘরে না গিয়েই সেই স্টেশনের দিকে রওনা হলেন যেখান থেকে এক্কা বাটালা যায়। বাটালা রেল স্টেশনে পৌঁছে ট্রেন দিল্লী যাবার জন্য দাঁড়িয়ে ছিল। মাওলানা নুরুদ্দীন (রা.)-এর কাছে টিকিট ক্রয়ের টাকা ছিল না। উপায় উপকরণের মালিক আল্লাহ্ আর আল্লাহ্‌র মসীহ্‌র আদেশে কোন রূপ দেরি না করেই তিনি রওনা হয়েছিলেন, সেই খোদা অলৌকিকভাবে তাঁকে সাহায্য করলেন। প্লাটফর্মে এক হিন্দু বন্ধু আসে আর বলে, আমি কাদিয়ানে আপনার সাথে দেখা করতে যাচ্ছিলাম, আমার স্ত্রী খুব অসুস্থ। তাকে দেখে আপনি ঔষধ লিখে দিন। মাওলানা সাহেব বললেন, আমি তো এই ট্রেনে দিল্লী যাব, তাকে এখানে নিয়ে আসুন, আমি ঔষধ লিখে দিচ্ছি। তিনি অসুস্থ মহিলাকে নিয়ে আসলেন। তিনি (রা.) ঔষধ লিখে দিলেন আর হিন্দু ভদ্রলোক দিল্লী পর্যন্ত রেলের টিকিট আর কিছু নগদ অর্থ হযরত নুরুদ্দীন (রা.)-কে দিয়ে দিলেন।

সুধী শ্রোতা! মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আদেশ লাভের পর এক মিনিটও সময় নষ্ট হোক– মাওলানা নুরুদ্দীন সাহেব তা চান নি। যখন স্বচ্ছ নিয়্যত এবং নেক নিয়্যতে আদেশ পালন শুরু করা হয়, তখন উপকরণের ব্যবস্থা আল্লাহ্ স্বয়ং করেন। এ ঘটনায় আমাদের জন্য অনেক বড় উপদেশ রয়েছে। যখনই হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল-খামেস (আই.) কোন উপদেশ প্রদান করেন, তখন আমাদের জন্য আবশ্যক হল, তৎক্ষণাত তার ওপর আমল করা। এরপর এক মুহূর্তও নষ্ট করা উচিত নয় এবং আমাদের মধ্য থেকে কেউ যেন আদেশ লঙ্ঘনকারী বলে সাব্যস্ত না হয়।

আদেশ শোনার সাথে সাথে দ্রুত আদেশ পালনের বিষয়ে আরও একটি ঈমান উদ্দীপক ঘটনা হল:

"হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর এক সাহাবী বাবা করীম বকশ সাহেব (রা.) ১৯০৫/৬ এর জলসায় মসজিদে আকসা কাদিয়ানের পেছনের বাজারে ছিলেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) মসজিদে আকসার মিম্বরে দাঁড়িয়ে মসজিদে উপস্থিত লোকদের উদ্দেশ্যে বললেন, বসে পড়ুন। বাবা করীম বকশের কানে যখনই এই শব্দ আসলো তখনই তিনি বাজারে বসে পড়লেন আর বসে বসে মসজিদের সিঁড়িতে পৌঁছলেন এবং বক্তৃতা শুনলেন।"[হযরত আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রা.)-এর এমনই একটি ঘটনা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।]

বাহ্যত হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর এই আদেশ উপস্থিত লোকদের জন্য ছিল কিন্তু বাবা করীম বখশ সাহেব হুযূরের আদেশ শোনার পর চান নি– এক মুহূর্তের জন্য আদেশ লঙ্ঘনের দোষ তার প্রতি আপতিত হোক। আপনারা এই দৃশ্য সেদিন দেখেছেন যেদিন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল-খামেস (আ.)-কে খিলাফতে সমাসীন করলেন। যখন তিনি আদেশ দিলেন বসে যাও, তখন ইবরাহীমের পক্ষীকুল সেই মুহূর্তে বসে গেল।

সুধী শ্রোতা! জীবনের প্রত্যেক মুহূর্তে আনুগত্যের এই স্পৃহা আমাদের সকলের মাঝে থাকা আবশ্যক। কেননা এটিই আমাদের জামা'তের সফলতার চাবিকাঠি।

সুধী শ্রোতাবৃন্দ! হযরত চৌধুরী স্যার মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ খান সাহেবকে আল্লাহ্ তা'লা আধ্যাত্মিক ও জাগতিক উভয় সফলতার চূড়ায় আরোহণ করিয়েছেন। একবার কেউ তাঁকে প্রশ্ন করলেন, আপনার উন্নতির রহস্য কী? তিনি উত্তরে বললেন, "আমি আমার সারাজীবন খিলাফতের পরিপূর্ণ আনুগত্য করেছি।"

(আল ফযল, ১৪ জুন ২০১০, পৃ.৪)

প্রফেসর ড. আব্দুস সালাম মরহুমের এমনই এক ঘটনা রয়েছে। একদিকে আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে সফলতার চূড়ায় আরোহণ করিয়েছেন অপরদিকে তিনি যুগ-খলীফার পরিপূর্ণ আনুগত্যকারী ছিলেন। তাঁর বিষয়ে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) বলেন, আমি বয়সে তাঁর থেকে ছোট, জাগতিক শিক্ষার দিক দিয়ে তো তার ধারপাশেও না, কিন্তু যখন আমার সাথে কথোপকথন হত, তখন সম্মানের সকল দিক, যা খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত থাকার কারণে সৃষ্টি হত, তিনি তা পূর্ণ করতেন। আমি অবাক হতাম, আর পরামর্শ করতাম। আমি যা বলতাম তিনি তাই বলতেন, আমি যা বর্ণনা করতাম তিনি সে কাজ সম্পাদন করতেন।

(আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১০-১৬ জানুয়ারি ১৯৯৭)

সুধী শ্রোতাবৃন্দ! হযরত রসূলে করীম (সা.) একবার তবলীগের উদ্দেশ্যে তায়েফে গেলেন। সেখানে তাঁর অনেক বিরোধিতা হয়। অবশেষে তিনি তায়েফ থেকে ফেরত আসছিলেন। তিন মাইল পর্যন্ত তাঁর ওপর পাথর মারা হল। সারা দেহ রক্তরঞ্জিত হয়ে গেল। তখন পাহাড়ের ফিরিশতা হুযূর (সা.)-এর কাছে আসল আর বলল, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। আপনি যদি চান তাহলে দুই পাহাড়ের মাঝে তায়েফের অধিবাসীদেরকে গুঁড়িয়ে দিতে পারি। রসূলে করীম (সা.) যাকে আল্লাহ্ তা'লা রাহমাতুল্লিল আলামীন বানিয়েছিলেন, তিনি বললেন, না, না। আমি আশা রাখি, আল্লাহ্ তা'লা এদের মধ্য থেকে এমন লোক সৃষ্টি করবেন যারা এক খোদার ইবাদত করবে।

(সীরাতে খাতামান নাবিয়্যীন, পৃ. ১৮৪)

সুধী শ্রোতাবৃন্দ! হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর যুগে কুরআন, হাদীস আর তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী প্লেগের শাস্তি অবতীর্ণ হয়। হাজার হাজার লোক কীট-পতঙ্গের মত মরতে লাগলো। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাদের মৃত্যু সহ্য করতে পারছিলেন না আর আল্লাহ্ তা'লার কাছে খুব কান্নাকাটি করে দোয়া করলেন, হে খোদা! যদি এরা প্লেগের শাস্তি পেয়ে ধ্বংস হয় তাহলে তোমার ইবাদত করবে কে?

(সীরাতে তাইয়্যেবা, দূররে মানসুর, পৃ. ৫৪)

সুধী শ্রোতা! আপনারা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বাণী শুনলেন! খলীফা মূলত রসূলের প্রতিচ্ছায়া হয়ে থাকে। (শাহাদাতুল কুরআন, রূহানী খাযায়েন, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩৫৩) হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল-খামেস (আ.) কয়েক বছর ধরে পৃথিবীকে বিশ্বযুদ্ধ সম্পর্কে সতর্ক করছেন। একদিকে তিনি সেই ভয়ংকর বিপদ সম্বন্ধে জগতকে অবগত করছেন আর এর ফলে যে ধ্বংসযজ্ঞ হবে সে বিষয়েও অবগত করছেন। অপরদিকে রাহমাতুল্লিল আলামীন (সা.)-এর দাসত্বে সেই দয়ার দৃশ্য আমরা দেখতে পাই। জামা'তের সদস্যদের জগদ্বাসীর জন্য বার বার দোয়া করার জন্য যুগ-খলীফা তাকিদপূর্ণ নির্দেশ দিচ্ছেন। তিনি বলেন:

"প্রতিদিন এক নতুন সংবাদ আসে যে, আজ যুদ্ধের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হতে যাচ্ছে, আজ ধ্বংস হতে চলেছে। বড় বড় পরাশক্তিদের দেখে বাহ্যত মনে হয়, যুদ্ধের দিকে তারা যে গতির সাথে অগ্রসর হচ্ছে, তাতে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হওয়ার কোন চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না তাই আল্লাহ্ তা'লা বিশেষভাবে মুসলমানদেরকে আর বিশেষত আহমদীদেরকে ঐ যুদ্ধসমূহের অশুভ পরিণাম থেকে সুরক্ষিত রাখুন। যদি এখনও আল্লাহ্ তা'লার কাছে তাদের সংশোধন সম্ভব হয়, আর সংশোধনের কোন মাধ্যম সৃষ্টি হয়, যদি তারা খোদা তা'লাকে চিনতে পারে, তাহলে তিনি সেই অবস্থা সৃষ্টি করুন যেন তারা তাঁকে চিনতে পারে আর ধ্বংস থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারে।

(খুতবা জুমু'আ, ১৮ মে, ২০১৮, সাপ্তাহিক বদর, ৭জুন ২০১৮)

সুধী শ্রোতাবৃন্দ! আনুগত্য আমাদের কাছে আশা করে, আমরা যেন ব্যথিতচিত্তে দোয়া করি, আল্লাহ্ তা'লা যেন বর্তমান যুগের লোকদেরকে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল-খামেস (আই.)-এর উপদেশসমূহের ওপর আমল করার সৌভাগ্য দান করেন এবং ঐশী শাস্তি থেকে রক্ষা করেন। কেননা সতর্কীকরণ ভবিষ্যদ্বাণী তওবা, দোয়া এবং সদকার মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়। খিলাফতের আনুগত্য– সফলতার চাবিকাঠি"– এ বিষয়ে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল-খামেস (আই.) বলেন, যদি আপনারা উন্নতি করতে চান এবং এ জগতে বিজয় লাভ করতে চান, তাহলে আপনাদের জন্য আমার উপদেশ, আপনাদের জন্য আমার বাণী হল, আপনারা খিলাফতের সাথে সংযুক্ত হয়ে যান। আল্লাহ্ তা'লার এই রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরুন। আমাদের সকল উন্নতির মূলমন্ত্র হল খিলাফতের সাথে যুক্ত থাকা।

(আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২৩-৩০ মে ২০০৩, পৃ. ১)

অবশেষে, দোয়া করি, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলকে হুযূর (আই.)-এর ঠিক সেভাবে পরিপূর্ণ আনুগত্য করার সৌভাগ্য দান করুন যেভাবে সাহাবীরা (রা.) রসূলুল্লাহ (সা.) এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাহাবীরা তাঁর আনুগত্য করতেন। আরও দোয়া করি, আল্লাহ্ তা'লা এই আনুগত্য কবুল করুন এবং আমাদের জামা'তকে আর আমাদেরকে আর আমাদের সন্তানসন্ততিকে ইহকালে ও পরকালে অগণিত কল্যাণে ভূষিত করুন এবং বিজয় ও সফলতা দান করুন, আমীন।

যুগ ইমামের বাণী

স্মরণ রেখো! কাজ তারাই করতে পারে, অর্থাৎ ধর্মের সেবা তারাই করতে পারে যাদের মধ্যে স্বর্গীয় জ্যোতি বিদ্যমান।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৩)

দোয়াপ্রার্থী: **Jahanara Begum, Bhagbangola, (Murshidabad)**

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir